গরুর রচনা
গৌতম চৌধুরী

গরুর রচনা

গৌতম চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৪১৯

স্বত্ব
সাম্পান চৌধুরী

প্রচ্ছদ
তৌহিন হাসান

প্রকাশক
বইয়ের দোকান
www. boierdokan.com

মূল্য
শূন্য/-

gorur rochona
a collection of prose
by gautam chaudhury
published by boiyer dokan
www.boierdokan.com

উৎসর্গ
আহমদ ছফা
এক চিরজাগরূক মনীষার স্মৃতিতে

অন্যান্য রচনা
নির্বাচিত কবিতা

সূচিপত্র

৭ কীর্তিনাশা একটি নদীর নাম
২৯ ধনেশ পাখির হাড়
৬৬ মনভ্রমরার সাঁটলিপি

গত সাড়ে তিন দশকে কবিতা লেখার ফাঁক-ফোকরে দু'চার কিসিম গদ্যও লিখে ফেলা গেছে যা হোক। কবিতার সাথে সেসবের কুটুম্বিতা প্রায়শই খুব ফিকে। অনধিকারীর মতো প্রায়ই তারা ঢুকে পড়েছে রাজনীতির ভাষায় কিংবা ভাষার রাজনীতিতে। কোনও তালেবরের বয়ানে নয়, বরং সামাজিক থাকবন্দের, জ্ঞানচর্চারও, একেবারে প্রান্তিক অবস্থান থেকে, নিরুপায়ভাবে, নানাসময় রচিত হয়ে উঠেছে এগুলো। প্রকাশিত হয়েছে নানান ছোটকাগজের হারিয়ে যাওয়া পাতায়। সেগুলিকে একটি মলাটের আওতায় জড়ো করার চিন্তাটা হয়তো নিছকই খানিক মানবিক মায়াবশত।

বই বলতে এখনও আমরা ছাপা-বইয়ের কথাই বুঝি। হাল আমলে, বৈদ্যুতিন কারিগরির সুবাদে বিখ্যাত লেখকদের বৈ-বই (ই-বুক) সংস্করণেরও চল হয়েছে। সেসবই ছাপা-বইয়েরই এক রকম আভাসী চেহারা। তবে, আমরা যাদের উন্নতবিশ্ব বলি, এই কারিগরি যেখানে অনেকটাই হাতের মুঠোয়, সেখানে তরুণ লেখকেরা অনেকে ছাপার আগেই সরাসরি বৈ-বইয়ের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন।

আমার এই বইটিও পাকেচক্রে ছাপার আগেই বৈ-বই হিসেবেই প্রকাশ পাচ্ছে। এই পাক এবং চক্র, দুয়েরই রচয়িতা হলেন আমার ছোটভাই মাহবুব মোর্শেদ। তাঁরই প্রেরণায় ও প্ররোচনায় এই বইয়ের প্রাদুর্ভাব। কাজেই পাঠকের নিন্দামন্দগুলিই শুধু আমার প্রাপ্য। তা বাদে, যদি সামান্যতম কোনও সমর্থনও কোনও প্রান্ত থেকে উচ্চারিত হয়, সেসবের অধিকারী তিনিই।

বিনীত
গৌতম চৌধুরী
১ চৈত্র ১৪১৮

কীর্তিনাশা একটি নদীর নাম

তৃতীয় পথের নিয়তি ৯
মরা সাহেবের জামা বা কলকাতার নাট্যজনের প্রতি কিছু অসতর্ক সংলাপ ১২
একটি কাল্পনিক চিঠির খসড়া ১৫
মেঘের পরে মেঘ ১৭
মাঘনিশীথের সূর্য ২২
কীর্তিনাশা একটি নদীর নাম ২৫
অভুক্ত আত্মার বিষপথ্য ২৭

তৃতীয় পথের নিয়তি

১.

বছর সত্তর আগে বাংলা ছোটকাগজের আদিপুরুষ প্রমথ চৌধুরী *সবুজপত্র* প্রকাশ করতে গিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন যে, বাঙালির সাহিত্যচর্চার সঙ্গে তার বাণিজ্যপ্রতিভার বিবাহ ঘটেনি। তাঁর মনস্তাপের পিছনে একটি অন্যতর আকাঙ্ক্ষাই ছিল অবশ্য। তিনি চেয়েছিলেন লেখকদের পেশাদার হয়ে ওঠার অবকাশ, যা যেকোনও সৎ লেখকেরই কাম্য। কিন্তু আজ এত বছর পরে, আবার যদি তাঁকে এসে বসতে হ'ত অমন কোনও অ-'ব্যবসায়ী' সম্পাদকের টেবিলে, চারপাশের হাওয়া-বাতাসের দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রাক্তন দীর্ঘশ্বাসের স্মৃতি তাঁকে দিয়ে নির্ঘাত আর এক দফা বীরবলি রসিকতা করিয়ে নিত।

এ-উপক্রমণিকা থেকে কেউ স্বভাবতই অনুমান করতে পারেন, অতঃপর আমরা প্রতিষ্ঠানবিরোধী কিছু তপ্ত লাভা উদ্গীরণ করতে চলেছি। না, তাঁকে আমরা হতাশ করতে চাইছি না। কারণ অফসেট-সাহিত্যের দাঁত ও নখ যেভাবে অন্ন-বস্ত্রের (পানীয়েরও) বরাভয়ের বিনিময়ে লেখকদের রোবট বানাতে চাইছে, ধরতাই বুলির মতো শোনালেও সেটা একটা ভয়ঙ্কর সত্য। তবু সবিনয়ে বলি, সত্য হলেও এটা ধরতাই বুলিও বটে। দৈত্য একটা আছে। আমরা লাইন বেঁধে গিয়ে তার ভোজ হিসাবে হাজির হচ্ছি। আর সামনে ও পিছনে প্রচুর নরম ও গরম বক্তৃতা করছি। দৈত্য মুচকি মুচকি হাসছে। কারণ বক্তৃতা ব্যাপারটায় সবধরনের দৈত্যেরই প্রবল আস্থা। তার জায়গা তাতে বেশ পোক্তই হয়ে ওঠে।

একথা সত্যি, লেখালেখির অন্যান্য পাড়ায় যাই হোক, কবিতাকে নিয়ে দৈত্যের তেমন কোনও মাথাব্যথা নেই। কারণ যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও, কবিতাকে দিয়ে তেমন কোনও কমার্স অদ্যাবধি গড়ে তোলা গেল না। তবু সাজসজ্জার পরের একফোঁটা সুগন্ধির মতো, কবিতাকে এখনও প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগছে। কিন্তু এ-সমীকরণ একেবারেই একতরফা। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের থেকেও বন্ধ্যা এই বন্ধুতা থেকে কবিতার পাওয়ার কিস্যু নেই : চিনেমাটির ধবধবে ডিশে সিঙাড়া মিষ্টি খাওয়া ছাড়া। শুধু এইটুকুর জন্য গৃহপালিত কুকুরও তার আনুগত্যের লেজ নাড়ানো পণ্ডশ্রম মনে করে। সে চায় প্রোটিন, গৃহকর্ত্রীর ওম্ এবং মাঝে মাঝে কুকুর প্রদর্শনীর ঝলসে ওঠা ক্যামেরা। কবিতার এমনকি সেটুকুও বরাদ্দ নেই। আর এই না-থাকাটাই কবিতার মস্ত সুবিধে। কাঠকুটোয় বানিয়ে নেওয়া তার দুয়োরানির সংসার। সুয়োরানির গরমমশলা-মাখা বাড়ির দিকে জুলজুল ক'রে তাকানোটা শুধু যে তার রুচিতে আটকায় তা-ই নয়, ওভাবে তাকিয়েও কিছুই পাওয়ার নেই বলে তার লোভও মরে গেছে।

২.

এতক্ষণে বোধহয় আমরা কিছুটা ইউটোপিয়ার দিকে এসে পড়তে পেরেছি। শমদমাদি গুণের অধিকারী ঋষিকুমারেরা এক কীর্ণ তপোবনে তাদের আপনমুগ্ধ মন্ত্রোচ্চারণে বৃত : এমনই কোনও আষাঢ়ে ছবির প্ররোচনায় বুঝি পৌঁছলাম শেষে। পৌঁছতে পারলে ভালোই ছিল। কিন্তু খাওয়া-পরার দৌড়ঝাঁপ সেরে যে-ছিবড়েটুকু অবশিষ্ট থাকে সমসাময়িক ব্যক্তিমানুষের, তার পক্ষে এই আশ্রমিকতার মঞ্চপোষ্য সংস্করণও একটু দামি বিলাসিতা। হুমড়ি খেয়ে পড়া শতাব্দীর মন্থর করুণ আলোয় তার অপবাস্তবতা আরও শোচনীয়। কাজেই ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় যখন ঘুচেছে, ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় পালটা একটা প্রতিষ্ঠান বানানো ছাড়া আজকের কবিতাকর্মী নিরুপায়। পর্ণকুটিরও একটি প্রতিষ্ঠান। তার সমস্ত অমালিন্য আর দারিদ্র্য নিয়েই, একটি রুচির বিকল্প একটি জীবনযাপনের বিকল্প হয়ে দুয়োরানির সেই সংসার গড়ে উঠতে পারে, যদি তাকে গড়ে তোলা যায়।

শিল্পের সামান্য সর্ত যেহেতু অনেকান্তিকতা, অনেকান্ত নয় এমন যেকোনও অনুমাতেই অস্বস্তি পাওয়া আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। ফলে, বর্তমান প্রস্তাবটির সামনেও যে নানা মাপের ভ্রূকুঞ্চন নানান সংশয়ে-উদ্বেগে ফেনিয়ে উঠবে, সে-সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। তদুপরি, 'মেলা' 'বাঁধা' 'গড়া' 'জোড়া' 'জোটা' ইত্যাকার ক্রিয়াগুলো সামাজিক নানা অনুষঙ্গে এমন ফ্যাকাশে আর ফাঁপা হয়ে গেছে যে, এদের ব্যবহারে উৎসাহিত হওয়া মুশকিল। বিশেষ ক'রে কবিতার মতো বিজন শিল্পের ক্ষেত্রে, বর্ষার ব্যাঙের মতো মোর্চা গঠন কোনও শুভ অর্কেস্ট্রাই গড়তে পারে না - ইতিহাসের সাক্ষ্য যখন এমন। তাই যদি হয়, তাহলে কোনও বিকল্প আলাপ ফেঁদে বসার যৌক্তিক অবকাশ কোথায়?

উত্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা নানাভাবেই করা যায়, প্রশ্নের গূঢ় প্রবর্তনার ওপরেই তা নির্ভর করবে। যেমন বলা যায়, বর্তমানের মামলায় পুরনো নজির টেনে আনা যেমন প্রাসঙ্গিক, নতুন সাক্ষ্য উপস্থাপিত করাও অবৈধ কিছু নয়। বরং ব্যবহারজীবির প্রয়াস সেদিকে ধাবিত হলেই তার মৌলিকতায় আস্থা আসে। কিন্তু না, এতটা স্থূলভাবে বলার দরকার হবে না বলেই মনে হয়। যেকথার স্পষ্ট উল্লেখ আরও জরুরি, তা হল, কোনও ইস্তাহার রচনার মঞ্চে জড়ো হবার আকুতি বর্তমানকে বিব্রত করছে না। নিজস্ব ঘূর্ণি ও চোরাবালি গড়ে তোলার স্বাধীনতা প্রত্যেক কবিতাকর্মীর মৌলিক অধিকার এবং তাকে খর্ব ক'রে কোনও সমাজতন্ত্রেই আপাতত পা বাড়ানো যাবে না। কিন্তু পাঠকের কাছে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষাও সেই স্বাধিকারের সম্পূরক। এখন দেখা যাক, এ যোগাযোগ রচনার ক'টি বিকল্প রয়েছে।

ক. মহাকালের হাতে সমস্ত দায় অর্পণ ক'রে নিরুদ্বেগ সমাহিত মনে কাব্যচর্চা করা। একে বলতে পারি আশ্রমমার্গ বা জ্ঞানযোগ। সত্ত্বগুণের অধিকারীদের অবলম্বন।

খ. প্রতিষ্ঠানের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর ক'রে বসে থাকা - কবে পুজোসংখ্যা থেকে নেমন্তন্ন আসবে বা প্রকাশক। একে বলা যায় বিশ্রমমার্গ বা ভক্তিযোগ। এই পথের দুটি শাখায় দুই সম্প্রদায় : কর্তাভজা ও অঘোরপন্থী। প্রথম পথ ন্যূনতম আত্মসম্মানকেও পাত্তা না দেবার। আর দ্বিতীয়টি ঘোর প্রতিষ্ঠানবিরোধী আড়ম্বরের আড়ালে বেলফুলের মালাটির দিকে আড়ে আড়ে তাকানোর। বলা বাহুল্য, তমোগুণ এ-মার্গের উপজীব্য।

গ. নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটানোর চেষ্টা করা। অর্থাৎ একটা স্ব-তন্ত্র প্রকাশনব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ-চেষ্টা যেহেতু ইতিহাসকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা, তা নিঃসন্দেহে অনুশীলনপ্রার্থী। তাই এই শ্রমমার্গ বা কর্মযোগ রাজসিকদের অবলম্বন।

৩.

এই ত্রিবেণীধারার ভিতর কোনটিতে আমরা অবগাহন করতে পারি? প্রথম পন্থা যে-সাত্ত্বিকদের, তাঁদের দূর থেকে প্রণতি জানাই। আর রাতের আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জে তাঁদের স্থাপন ক'রে নিজেদের খঞ্জ পৃথিবীর অন্ধকারে হামাগুড়ি দিই। চাঁদের রুক্ষ হিম প্রান্তরে যদিবা আমাদের বামন হাত পৌঁছয়, ঐ নক্ষত্রভূমি আমাদের গন্তব্যের পক্ষে বড় বেশি দূর। আবার প্রতিষ্ঠানগামিতার দু'নম্বর রাস্তায় আমরা চলতে চাইলেও, সে-পথ যে আখেরে আমাদের কোথাওই নিয়ে যাবে না, একথাও আমরা আগেই স্বীকার করেছি। তাহলে তৃতীয় পথের দুরধিগম্যতাই কি আমাদের নিয়তি? এই প্রশ্নের রূঢ়তার সামনে শোকযাত্রী সৈনিকের মতো নিবিড় মাথাটি নামিয়ে নেওয়া ছাড়া এইমুহূর্তে আমাদের কীই বা করার আছে? কারণ ইতিহাসের প্রার্থনাও সর্পিল সময় আর ভঙ্গুর সাধ্যের সামনে পড়ে উত্তীয়ের মতোই ফিরে যায়। আমরাও ফেরাই যদি, ফেরাবই। আত্মার আড়াল থেকে তবু কেউ বলে যাবে - বাজাব না আমাদের, বাজাব না জলপাই কাঠের এস্রাজ?

বৈশাখ ১৩৯০

মরা সাহেবের জামা বা কলকাতার নাট্যজনের প্রতি কিছু অসতর্ক সংলাপ

অনেকদিন পর বিদেশ থেকে ফিরেছেন আমাদের এক হাফপেন্টুলুন বয়সের বন্ধু। আড্ডার সবাই একদিন জড়ো হলাম সেই টানে। সেই কবে বিদেশ চলে গেছেন বন্ধু আমাদের! অনেক গল্প শোনা যাবে। শুরু হ'ল কথাবার্তা।

বন্ধু বললেন - দেশের হাল কী হয়েছে রে! এতটা যে খারাপ, ওখান থেকে তো বুঝিনি।

আমরা সব গম্ভীরভাবে বললাম - হ্যাঁ, দেশের অবস্থা আর ভালো যাচ্ছে কোথায়!

বন্ধু বললেন - এইরকম নোংরার মধ্যে মানুষ বাঁচতে পারে? পথের মুখে মুখে জঞ্জালের পাহাড়। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার রাস্তা নেই। আর এত ভিখারি - রিয়ালি ডিসগাস্টিং। সিগ্ন্যালে গাড়ি আটকালে তো আর রক্ষা নেই। পোকামাকড়ের মতো পেটমোটা হাড়জিরজিরে বাচ্চাগুলোকে দেখলে ভয়ে চোখ বুজতে হয়।

মুখ শুকনো ক'রে আমরা বললাম - ঠিক।

এক বন্ধু আলতো গলায় বললেন - ভিখারি তো এখানে বরাবরই ছিল রে। যখন আমরা ইস্কুলে পড়তাম, তখন ইস্টিশনে ইস্টিশনে কেমন রিফিউজিদের ভিড়, মনে নেই?

- তখনও এরকম ছিল? কী জানি, আমি তো ...

- আচ্ছা, ওখানে সবকিছু খুব সাফসুরত, না?

- স্বর্গ, বুঝলি স্বর্গ। পাবলিক হেলথের এক্কেবারে হাইয়েস্ট ইম্পরটানস। কেউ এখানকার মতো এমন নোংরামির কথা ভাবতেই পারে না।

- আসলে আমাদের দেশটা এত গরিব...

- দেখ, পভার্টি ইস নট য়্যাটঅল আ ফ্যাক্টর। আসল ব্যাপারটা হ'ল কী জানিস - পরিশ্রম। ফাঁকিবাজি ব্যাপারটা ওদের ভোকাব্যুলারিতে নেই। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবি না।

- সে ভাগ্যি ক'রে কি আর আমরা জন্মেছি? তা হ্যাঁরে, আমাদের চান্স ফান্স কিছু মিলবে ওখানে?

- দূর দূর, এখন সব জায়গায় বেকারসমস্যা।

- না দেখ, ওদের আনএম্প্লয়মেন্টের নেচারটা ডিফারেন্ট। তবে চাকরি খালিও আছে। যেমন ধর, স্কুলটিচারি। এই ৮৫ সালেই একটা বড় শহরের ডিমান্ড ফর টিচারস হ'ল ১৬৫ হাজার, আর সাপ্লাই ১৪৮ হাজার। মানে টোটাল শর্টেজ ১৭ হাজার।

- সে কী রে, মাস্টারের ঘাটতি?

- হ্যাঁ। ৯০-এর দশকে হয়তো এই ঘাটতিটা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১১০ হাজারে।
- বলিস কী? তার মানে লোকে আর মাস্টার হ'তে চাইছে না! নির্ঘাত ভেতরে ঘাপলা কিছু একটা আছে।
- যাক গে, অন্য বাড়ির রান্নাঘর থেকে দুধ উথলানোর গন্ধ ছাড়লে তো আর আমাদের পেট ভরবে না। মিছিমিছি মাথা খারাপ ক'রে লাভ কী?
- তা বলে পেটের ক্ষিধেটা তো ঠোঁটে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে না। নিজের জমিতে ফসল না হ'লে সে আপনা থেকেই হাত বাড়াবে ভিনজমির ফসলে।
- তা বাড়াক, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের জমির দেখভালটা তো করতে হবে। নইলে, আগাছা এসে পা রাখার জায়গাটাও তো জড়াবে।
- তাছাড়া অমন বেফিকির ফেলে রাখলে হাতছাড়াই যে হবে না, তারই বা ঠিক কী!
- হতেই পারে। তখন কি ভিটেটাও বাঁধতে যাবি ঐ ভিনজমির বেড়ার ধারে?

তর্কটা যখন বেশ জমে উঠেছে, হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকলেন আমাদের আর এক বন্ধু। এসেই প্রবাসী বন্ধুকে দেখতে পেয়ে একেবারে 'আয় আয়' বলে, দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। প্রবাসী কেমন যেন ছটফটিয়ে উঠলেন - আরে আরে একী, এভাবে কেন, এভাবে কেন?
- মানে? চিনতে পারছিস না আমায়!
ইস্কুলজীবনে এরা দু'জন ছিলেন একেবারে যাকে বলে লোহা আর সিমেন্ট।
- চিনব না কেন? কিন্তু, এই বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি, তাও আবার পুরুষে-পুরুষে, এই নুইসেন্স এখনও এদেশে চলে!
- নুইসেন্স! কোলাকুলি তো প্রকাশ্যে পুরুষরাই করে। ক'বছর বাইরে কাটিয়ে তুই কি ভূত হয়ে এলি?
- ভূত হইনি, তবে এইডসের পাল্লায় পড়লে হ'তে বড়জোর কয়েক মাস!
- এইডস!
- হ্যাঁ, একোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম।
- দাঁড়া দাঁড়া, সেটা আবার কী!
- তোরা এইডসের কথা শুনিসনি? এ টোটালি আনকিওরেবল ডিজীজ। কোনও ওষুধই কাজ করে না। পেশেন্ট গ্রাজুয়ালি কোলাপ্স করে।
- ক্যানসার জানি, হার্ট য়্যাটাক জানি, এ-অসুখের নাম তো শুনিনি।
- ক্যানসারের চেয়েও ডেঞ্জারাস। ক্যানসার তো আফটার অল ইনফেকশাস নয়। এইডস তো হাইলি ইনফেকশাস। পেশেন্টের ঘাম থেকেও সুস্থ মানুষ ইনফেক্টেড হয়ে যেতে পারে। ওদেশে তো এটা এখন একটা এপিডেমিক।
- এপিডেমিক?

- হ্যাঁ। গত ৪ বছরে ৬ হাজার মানুষ মরেছে, এই মুহূর্তে আরও ৬ হাজারের সামনে নিশ্চিত মৃত্যু।
- তবে তুই যে পাবলিক হেলথের কথা বলছিলি...
- আচ্ছা, অসুখের কথাটা নয় বুঝলাম, কিন্তু তার সাথে পুরুষ মানুষের কোলাকুলির, মানে ইয়ে, সম্পর্কটা কী!
- আরে রোগটাই যে পুরুষবাহিত।
- তাই বল! এখন বুঝতে পারছি, সেদিন ভাগ্নেটা বলছিল যেন কীসব... সাহেবদের ফেলে দেওয়া জামা শহরের পথে পথে সস্তায় বিক্রি হচ্ছে, ওসব পরলে নাকি অসুখ করতে পারে। তো, এই হ'ল সেই ব্যামো!
- আমাদের দেশে তো ভাই এসব সাহেবি রোগ কোনওদিনও ছিল না।
- আমার তো ভয় করছে, তুইই আবার রোগটা এখানে বয়ে আনলি না তো!
বন্ধু একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েন - না না, আমরা প্রত্যেক মাসে থরো চেক আপ করাই।
- তোমাদের চেক আপকে নমস্কার ভাই...
এমন সময়ে একজন বললেন - জামার কথা কী বলছিলি রে?
- আরে ঐ যে জাদুঘরের সামনে ঢেলে বিক্রি করছে, ১০-১২ টাকার সব জামা।
- ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতো গরমকালে আমি ১ জোড়া কিনেছিলাম।
- আমারও তো আছে ১ জোড়া গেঞ্জি...
- এই তুই ঠিক জানিস...
- কী জানি ভাই...
- সস্তায় পেলে কে ছেড়ে দেয় বল...
- কে জানে, সাহেবদের ভূত এইভাবে আমাদের ঘাড়ে চাপবে...

সেদিনের আড্ডা সেখানেই কেমন যেন মাঝপথে থিতিয়ে গেল। বিদেশের ঝকঝকে গল্প আর শোনা হ'ল না। তারপর একদিন বিদেশ থেকে আসা বন্ধুও ফিরে গেলেন বিদেশে। পড়ে রইলাম আমরা - আমাদের নোংরা, কুঁড়ে, গরিব, বোকা, এই শহরটাকে নিয়ে। যেমন ছিলাম, হুবহু ঠিক তেমনটাই।

অবশ্য, একেবারে হুবহু ঠিক তেমনটাই নয়! একটা নতুন ভয় এসে আমাদের সবার বুকে কোটর গেড়ে বসল। কারণ আমরা সবাইই তো জেনে না-জেনে ঐসব সস্তার বিদেশি জামা এতদিন ধরে গায়ে চাপিয়েছি। এখন কতবার স্নান করলে যে আমরা আবার শুদ্ধ হব, কে জানে!

অক্টোবর ১৯৮৫

একটি কাল্পনিক চিঠির খসড়া

সম্পাদক, *কথাশহর*, প্রিয়ভাজনেষু,

বহুদিন পর, কাল রাত্তিরে একটা সামুদ্রিক হাওয়া উঠেছিল। কলেজ স্ট্রিটের গলি ছাপিয়ে সেই হাওয়া এসে ঝাপটা মারছিল শহরের খাঁচায়। এমন সময়ে আপনার সাথে দেখা। আপনার সাথে দেখা হলে আমি যে খুব স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ি, এ-কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। যদিও এমন একটা সময় ছিল, যখন আমরা একসাথে কাজ করব বলে ভেবেছিলাম। করেওছিলাম কিছুটা। তারপর কোনও অন্তর্গত প্রেরণার তর্জনীতে আপনি 'মহাদ্রুম' হওয়ার সাধনায় আশ্রমিক হলেন। 'এরণ্ড' আমার পক্ষে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

যাই হোক কালকের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের শেষে, আপনি লেখা চাইলেন, *কথাশহর*-এর জন্য। আমি তো খুবই কম লিখি। সেজন্য, অনেক কাগজে, যাঁরা লেখা চান, লিখে উঠতে পারি না। অবশ্য শুধু এই কারণে *কথাশহরে* না-লিখতে পারলে, আজ এ-চিঠি লিখতে হ'ত না। আসলে, *কথাশহর*-এ আমি লিখতেই চাই না।

কারণটা খুব স্পষ্ট। আমি, আমার আরও অনেক সতীর্থের মতোই, ছোটকাগজের লেখকই থাকতে চাই। বড় কাগজ ছিল, থাকবে। তা কোনওদিনই কবিতাকে পুষ্টি জোগায়নি। ছোটকাগজের ধারাবাহিক স্রোতঃপ্রবাহ এগিয়ে নিয়ে গেছে বাংলা কবিতার আঁকাবাঁকা বহর। অবস্থা এখানে থেমে থাকলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু প্রতিযোগিতাহীন বাজারে আজ বড় কাগজ স্বপ্ন দেখছে, পুরো বঙ্গসংস্কৃতিটাকেই মুঠোর মধ্যে কামড়ে ধরার। আজ সে ক্রেতারুচিকে দৈত্যের মতো নিয়ন্ত্রণ করছে। এমন কি 'ক্রেতারুচি' শব্দটির ওপর সশব্দে বাতকর্ম ক'রে দিলেও তাকে ঠেকানোর কেউ নেই। সে বলছে : এই হ'ল ছবি, নতমস্তক ক্রেতা বলছে : ছবি। সে বলছে : এই হ'ল ফিল্ম, এই হ'ল থেটার, এই হ'ল নাচ-গান-বাজনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি, কীভাবে বিছানায় শোবেন, কোন দোকানের চটি কিনবেন, স্কুলপড়ুয়া মেয়েকে কোন গর্ভনিরোধক খাওয়াবেন - এসবও রয়েছে সেই ফর্দে। আর সাহিত্য? সে তো তার পুরনো পণ্য। হালে তা দিয়ে ব্যবসা ততদূর না হলেও, গোটা ব্যবসাটাতে একটা পবিত্র পুণ্যকাজের চেহারা দিতে আজও সাহিত্যের জুড়ি নেই। আর, সে-কাজে সব থেকে দামি সুগন্ধি হ'ল কবিতা। কাজেই যত অবাণিজ্যিকই হ'ক, কবিতার ওপর বড় কাগজের থাবা আগে কখনও এমন সনখ হয়ে বসেনি। আজ সে পুরোপুরি কবিতাবিরোধী।

এ তো গেল মালিকের দিকটা। তার কর্মচারী কবি-সাহিত্যিকদেরও একটা ভূমিকা আছে বই কি। তাঁরা বুড়ো হয়েছেন। কাজেই ভিমরতি ধরাটা

সময়োচিত। এতদিন নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ-যশাদি উপার্জন করলেন। আজ হঠাৎ টনক নড়েছে – ইতনা উঁচু চেয়ারে এতদিন রইলাম, অথচ গোটা উত্তরকালটা আমাদের কেয়ার না ক'রে চলছে! এমনকি এমন একটা রটনারও চেষ্টা চলছে, এইসব ক্ষুদেরা নাকি বাংলা কবিতায় এমনই মোচড় দিয়েছে যে আমরা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছি। ছেলেধরা বস্তা নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো। দরিদ্রকে দেখাও অর্থলোভ, অক্ষমকে দাও শিরোপা। তাঁদের ভাগ্য ভালো, আমাদের মধ্যে থেকে কিছু লোভী ও দুর্বলচিত্ত প্রতিভাকে তাঁরা কব্জা করেছেন!

এর পরেও সরলমতি আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এসব কাণ্ডের সাথে *কথাশহর*-এ না-লেখার সম্পর্ক কী? দেখুন, *কথাশহর*-এ যাঁরা ইতিমধ্যে লিখেছেন এবং যাঁরা অতঃপর লিখতে চান, তাঁরাও আজ একথা জেনে গেছেন যে, *কথাশহর* আসলে ঐ প্রভুকাগজেরই সৃষ্টি। যখন বৃদ্ধেরা তাঁদের নানান প্রয়াসেও জালে বেশি মাছ তুলতে পারলেন না, *কথাশহর*-কে নামানো হ'ল। তারুণ্যের ছদ্মবেশে তারুণ্যকে বধ করার জন্য। এনে দেওয়া হ'ল ভোপালের বিষাক্ত ডোল। হায় সম্পাদক, এখনও আপনাদের প্রভুকাগজের বড় আমলা-কবিকে ভোপালের সমর্থনে লিখে যেতে হচ্ছে – দারিদ্র্য-বিমোচনের চেয়ে কবিতার জন্য অর্থব্যয় অনেক মহৎ কাজ ইত্যাদি! এইসব ছেঁদো যুক্তির বিরুদ্ধে শব্দব্যয় বাহুল্য। কারণ এসব কথা তো আপনিও জানেন যে, ভোপালের সরকার প্রথম থেকেই কার্বাইড-কে আড়াল করতে চেয়েছে। আক্রান্তদের যথার্থ ওষুধ দেয়নি, যাতে প্রমাণ হয়ে যায় সেই প্রাণঘাতী গ্যাসের স্বরূপ। উলটে, যেসব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (তার মধ্যে কলকাতার তরুণ চিকিৎসকরাও ছিলেন) প্রকৃত ওষুধ নিয়ে যাচ্ছিলেন, পুলিশ লেলিয়ে লাঠিপেটা ক'রে তাঁদের ভোপাল থেকে ভাগানোর দায়িত্ব পালন করেছে। ঘাতক-বহুজাতিকের মদতদাতা সেই সরকারের বাজেটের ১% টাকায় চলে আপনাদের ঐ ভারতভবন। যার একমাত্র ব্রত হচ্ছে, ভারত এবং পৃথিবীর সংবেদনশীল মানুষের মন থেকে ভোপালের ভয়ঙ্কর স্মৃতি মুছে দেওয়া। ঐ টাকা নিতে আপনারা শিউরে উঠলেন না?

কাজেই *কথাশহর*-এ আমি লিখছি না। শুধু তাই নয়, যাঁরা *কথাশহর* এবং তার প্রভুকাগজে লিখে বিখ্যাত হতে চান, তাঁদের অনুরোধ করব, দয়া ক'রে *অভিমান*-এ লেখা পাঠাবেন না। *অভিমান*-এর প্রচারসংখ্যা মাত্র ৫০০। এতে না-লিখলেও আপনাদের বিখ্যাত হওয়া আটকাবে না।

আমরা বিখ্যাত হতে চাই না, লিখতে চাই। আত্মঘাতী হতে চাই না, আত্মরচনা করতে চাই।

ভালোবাসা জানবেন। শুভার্থী

চৈত্রসংক্রান্তি ১৩৯৫

মেঘের পরে মেঘ

এই শ্রাবণের বুকের ভেতর

ফি-বছর যত বন্যাই আসুক, মেঘের জন্য আমাদের হাঘরেপনা কি কমবার! বাংলা দরিয়ে পেরিয়ে কখন আসবে পেল্লায় পেল্লায় সব মেঘ। হঠাৎ পাক খেয়ে ওঠা একটু সোঁদা গন্ধের নোনতা হাওয়া, মহল্লা খান খান ক'রে আছড়ে পড়া দশ-বিশটা কড়াক্কড় বাজ, আর ঝোঁ ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি। পাখিপ্রেমী খাঁচাশুদ্ধু স্নান করাচ্ছে পাখিদের। গা ঝাড়া দিচ্ছে পাখি, আর চেঁচাচ্ছে - জি হাঁ... জি হাঁ... । রাস্তায় ঊর্মি, আর দোদুল ভাসমান রিকসা। ছেলেমেয়েরা হাঁসের মতো খলবল করতে করতে ফিরছে ইশকুল থেকে। তাদের শাড়ি-গুটনো মায়েরাও আজ কিশোরী। এরপর অফিসবাবুদের নাকানিচোবানি খিস্তিখেউড়। রাজ্যের হাতে আর কত অধিক ক্ষমতা পেলে যানজট বন্ধ হবে - জবাব দাও। আর, এইসব ফাজলামির ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সময়ের ঢেউ। তিয়েন আন মেনের অন্ধকার ফুঁড়ে ভেসে আসছে মানুষকে পিষে যাওয়া ট্যাংকের ঘর্ঘর। ভাইবোনের রক্ত ধুয়ে-মুছে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে স্বর্গীয় শান্তি। পায়রা উড়ছে সেইন নদীর তীরে। পৃথিবীর তাবৎ দুর্গাধিপরা জম্পেশ কায়দায় উদ্‌যাপন করছে দুর্গপতনের দু'শ বছর।

শ্রী শ্রী দুর্গ সহায়

মনে পড়ছে, বর্জইস হরফে এই শব্দ ক'টি ছাপা হয়েছিল বছর কয়েক আগের *ভাইরাস*-এ, আমাদেরই এক সতীর্থের চিঠির শীর্ষে। হয়তো সেটি মুদ্রণপ্রমাদই ছিল। কাগজটির তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক, দুর্গ-র পাশে কোনও সংশোধনী আ-কার নিজকলমে যোগ করেছিলেন কি না, মনে নেই। হয়ত অনভিপ্রেতভাবেই, 'দুর্গতিনাশিনী' দুর্গা একটিমাত্র স্খলিত হরফের মূর্ছনায় হয়ে উঠেছিল অন্ধকার খাঁচাকলের এক পাথুরে ভয়চ্ছবি।

আজ সেই দুর্গের হাঁমুখ মেলে ধরেছে তার সারি সারি দাঁতের সোপান। আর তাকেই স্বর্গদ্বার ভেবে অবলীলায় ঝাঁপ দিচ্ছেন কেউ। মাংসাশী ফুলের তীব্র গন্ধ কি এতই অপ্রতিরোধ্য যে, পতঙ্গপ্রাণ নিশ্চিত আত্মনাশকেও এইভাবে উপেক্ষা করবে! বিষকন্যার ঝলমলে মায়া কি এতই আচ্ছন্নক যে, ঋষিপুত্রের রেতস্খলনে কেঁপে উঠবে নদী! ভয়ে আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে আসে। ঘুরন্ত তলোয়ারের শত সহস্র নিষ্পলক চোখ ছায়া ফেলে আমাদের জলের গেলাসে, বালিশের নিচে, স্বপ্নের ডানায়, আমাদের লোভে যশোলিপ্সায় মগজের কাঙালিপনায়। সমস্ত কথা অর্থহীন হয়ে যায়। মনে হয় ধ্বনিহীন নিঃসময়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা ওড়াতে চাইছি আমাদের নিষ্ফল ভাষাপ্রণালী। ধ্যানের গভীর থেকে ফিরে এসে, এই খান খান মূর্তি নিয়ে আবার ফিরে যেতে হয় ধ্যানে।

হ্যাঁ, আমরাও ধ্যানে বিশ্বাসী। শিল্প যে এক বিজন চর্যার বিষয়, এক নিঃসঙ্গ অশৌচপালন, আত্মক্ষরণের এক সর্বগ্রাসী সূচ-চুম্বন, সময়ান্তরের এক অবয়বহীনতার দিকে স্বপ্নময় হেঁটে যাওয়া - এ সবই আমরা খুব বিনীতভাবে নিজেদের বিবেকের কাছে দাবি করি। ক্ষণিক মেঘসংঘর্ষে, উদ্‌যাপন করি। কিন্তু তার সাথে সাথে আমরা ভুলতে পারি না আমাদের কৌমচেতনা, ভুলতে চাই না। সময়ের যে-উষ্ণনিশ্বাস অবিরল ঝরে পড়ছে আমাদের চামড়ায়, তাকেই আমরা পোশাকের মতো ধারণ করি। অনম্বর হতে আমাদের লজ্জা নয়, শীত করে।

তাই আজ যখন শিল্পের নিভৃত পরিমণ্ডলকে লণ্ডভণ্ড ক'রে দেবার, উপভোক্তার রুচিকে অবনমিত-বিকৃত ক'রে দেওয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ, আমরা আমাদের নিরুপায় প্রতিক্রিয়া না-জানিয়ে পারি না। সমাজ-সময়ের অন্নজলের ঋণ অপরিশোধ্য। সেই আশ্রয়-মাটির অস্তিত্বের ওপরই যখন আঘাত নেমে আসছে, নীরবতা তখন বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করবে মাত্র।

আমাদের এই আচরণে যাঁরা ঘৃণা ও বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছেন নির্দলীয়তার আপাত শান্তিচ্ছায়ায়, তাঁদের বরমাল্য যে দৈত্যতন্ত্রেরই পায়ে গিয়ে পড়বে, এ হয়তো প্রত্যাশিতই। কিন্তু সেই আত্মসমর্পণের কোনও যুক্তি 'শুদ্ধচারী'দের ভাঁড়ারে নেই। যদি আমরা ত্যজ্যও হই, সেই স্বর্গদ্বার-সন্ধানীদের অবগতির জন্য এইটুকু লিপিবদ্ধ থাক - আমরা কোনও দলরচনায় ব্রতী নই। আজ থেকে ৩৬ বছর আগে একটি নবজাত কবিতাপত্রের নবীন সম্পাদক লিখেছিলেন - '... আসল কথা হ'ল তরুণদের একটি গোষ্ঠি বা দল গড়ে ওঠা। আমাদের ধারণায় এই দল... একান্ত প্রয়োজন'।[১]

কোন্ রত্নদ্বীপের মায়াবী হাতছানি থেকে তৎকালীন সেই ইস্তাহারের উৎসারণ, তার উল্লেখ আজ বাহুল্যমাত্র। দুর্গের বড়-মেজ-সেজ লাঠিয়ালের গম্ভীর ভূমিকায় সেই দলভুক্তদের আজ মানিয়ে যাচ্ছে চমৎকার!

আজ যে সেই মধুচক্র উত্তরাধিকারী তল্পিবাহক খুঁজবে, সে তো স্বাভাবিক। লোভী, অক্ষম, উমেদারদের ভিড়ে যে সেই দরবার সরগরম হয়ে উঠবে, এতেও বিচলিত হবার কিছু নেই। কিন্তু কোনও প্রকৃত কবিকে সেই হাফ-আখড়াইয়ের আসরে উপস্থিত দেখলে, সমস্ত প্রজন্মকেই হেঁটমুণ্ড হতে হয়। দুর্গ থেকে ভেসে আসে উল্লাসের চাপা শব্দ।

বন্ধু রহ রহ সাথে

মানুষের মরতে বসা সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোর ভেতর বন্ধুপ্রীতি যে আজও মাঝ মাঝে কাহিনি গড়ে তোলে, সে আমাদের ভাগ্য। অবশ্য বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে পক্ষপাতও হয়ে যায় অনেক সময়ে। আবার এমনও তো হয়, বন্ধুর যা ধাতে সইবে না, আঁতে

সইবে না, তাই দিয়েই তাকে আপ্যায়িত করার প্রয়াস নেওয়া হ'ল! অল্পাহারীকে ভূরিভোজ পরিবেশন, বা, মুণ্ডিতমস্তককে উপহার দেওয়া চিরুণি।

কোনও বন্ধুকে আঘাত করা, তা তিনি যত বিপরীত মেরুতেই অবস্থান করুন, আজও বেদনার কারণ। কোনও কুৎসা বা অপযশ কীর্তন তো আমাদের অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এই নিষ্ঠুর সময় আমাদের কাছ থেকে যে-নৈর্ব্যক্তিকতা দাবি করছে, তাতে আত্মীয়-পরিজনকেও অশুভব্যূহে দেখলে আত্মসংবরণ দুরূহ হয়ে উঠেছে। কাজেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার মহত্ত্ব সর্বদা দেখানো যায় না।

সম্প্রতি এক বন্ধু তাঁর পত্রিকায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমার নতুন কবিতাবইটির একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই মহানুভবতায় তো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠারই কথা। উপরন্তু, ছোটকাগজে এমনটা হয়েই থাকে। কিন্তু সেই পত্রিকাটি যেহেতু ভোপালের ভারতভবনের আর্থিক সমর্থনপুষ্ট, তার প্রতিটি ইঞ্চিই এক ভয়াবহ বিষবাষ্পের স্মৃতি বয়ে আনে।

আপাতভাবে সংকীর্ণতাদুষ্ট এই বয়ানটির সমর্থনে দু'চার কথা না-বললেই নয়।

অনুদানটা দিচ্ছেন কারা? দিচ্ছেন এমন একটি সংস্থা, সম্প্রতি CAG[২] প্রতিবেদনে যেটিকে আর্থিক স্বেচ্ছাচার, স্বজনপোষণ ও এলিটতন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যে-সংস্থা থেকে শ্রীযুক্ত অশোক বাজপেয়ীকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠা অভিজাত শ্রেণির একটা ছোট চক্র লক্ষ লক্ষ টাকার সুযোগ-সুবিধা ও অনুদান উপভোগ ক'রে থাকেন।[৩]

তাতেও কোনও আপত্তি ছিল না। একটা ভালো কাজ করতে গেলে, আনুষঙ্গিক ব্যয়নির্বাহের টাকাটা কেমন মানুষ বা সংস্থা দিচ্ছে, তা নিয়ে মাথা না-ঘামানোটাই যখন রেওয়াজ। বিশেষত, তা যখন আমাদেরই করপুষ্ট সরকারি তহবিলের টাকা। কিন্তু এটা আমরা কী ক'রে ভুলি যে, ঐ অর্থের উৎস হ'ল - ভোপাল। ভোপাল থেকে আসা ১টি টাকাও আসলে গ্যাসপীড়িতদের বঞ্চিত ক'রে দেওয়া টাকা। এবং তা আসলে একটা জাতীয় চক্রান্তেরই অংশ। ভোপাল - উচ্চারণ করলেই যে ভয়ঙ্কর স্মৃতিশিহরণ জেগে ওঠে, তাকে ভুলিয়ে দাও। ভোপালকে ক'রে তোল ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। অনুদানের পর অনুদান, পুরস্কারের পর পুরস্কার দিতে দিতে, কিছুদিন পর যেন ভাবমূর্তিটাই পালটে যায় ঐ ঘাতক শহরের।

কাজেই, যতই ভারতীয়তার উদাত্ত আহ্বান তোলা হোক, ভাষা থেকে ভাষার অভিজ্ঞতাবিনিময়ের মহতী প্রয়াসকে সামনে রাখা হোক, ভোপালের টাকার বিষাক্ত গন্ধ চাপা থাকে না। দুর্ভাগ্য, ঐ টাকার কিছুটাও আমার অজ্ঞাতে আমারই বিজ্ঞাপনে ব্যয়িত হ'ল!

আর, ওপর থেকে চাপানো কোনও ভারতীয়তায়তে তো আমাদের বিশ্বাসও নেই। যে-ভারতীয়তার বয়নকেন্দ্র দিল্লী দরবার, আটপ্রহর যে-ভারতীয়তার প্রচার চলছে দূরদর্শনে, যা বকলমে হিন্দি আধিপত্যবাদের নির্লজ্জ নির্মাণ, তা-ই সূক্ষ্মভাবে প্রাদেশিক/আঞ্চলিক ভাষাকর্মীদের ওপর আরোপ করার প্রচ্ছন্ন ভূমিকা রয়েছে ভারতভবনের। হিন্দিবলয়ের নেতৃত্ব মেনে নাও, শিরোপা নাও। এবং এই নেতৃত্ব যাঁরা মানছেন, সেইসব অহিন্দি কবি-লেখকদের লেখা অনুবাদ ক'রে ভারতীয়তার আবহ বজায় রাখ। ভারতভবনের অনুমোদিত ভারতীয়তায় কি সেই হিন্দি নাট্যকারের ঠাঁই হবে, যিনি 'জহরিলি গ্যাসকাণ্ড'র জন্য কার্বাইড আর রাষ্ট্র, দুই প্রতিষ্ঠানকেই সমান দায়ী মনে করেন? বা সেই ওড়িয়া গল্পকারের, যিনি মানুষকে গরু-ছাগলের মতো উচ্ছেদ ক'রে অগ্নি উৎক্ষেপণের বিরোধী? বা সেই নেপালি প্রাবন্ধিকের, যিনি তাঁর ভাষার স্বীকৃতি চান অষ্টম তপশীলে? বা তেমন কোনও বাঙালি কবির, যিনি আজও ভুলতে পারেননি অঙ্গচ্ছেদের বেদনা? যাঁর বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে এইভাবে –

> বিরামহীন, গত দু'রাত ধরেই চলেছে এই মেঘের দল। যেন ৪৭ সালে সীমান্ত-পেরিয়ে-আসা উদ্বাস্তুদের মছিল। ঐ লম্বাটে মেঘটি আমার ঠাকুর্দা, ঐ দ্রুতগামী মেঘটি আমার বাবা, ঐ পিছিয়ে-পড়া ক্লান্ত মেঘটি আমার মা।
>
> অনেক রাতে ভেসে গেল সুঠাম, অভিজাত দুটি মেঘ পাশাপাশি – মনে হল নেহরু আর এডুইনা মাউন্টব্যাটেন।[৪]

রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার জন্মশতবর্ষের পুণ্যলগ্নে এতটা কি হজম করতে পারবেন ঐ আভিজাতিক ভারতীয়তার প্রবক্তারা?

তাই প্রশ্ন, কোনও এলিট প্রতিষ্ঠানের ঘেরেটোপের ভেতর থেকে সত্যিকারের কোনও মহা-ভারতীয় মূল্যবোধের অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠা কি সত্যিই সম্ভব? কোনও রাজপুরুষ বা তাঁদের বশংবদ সাংস্কৃতিক আমলারা কি আদৌ কোনও ভারত-আত্মার উদ্বোধনে উৎসাহী? না, তাঁরা শুধু অল্পমায়াদি গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধির জন্য একেক সময় একেক রকম ভারতীয়তার ধুয়া তোলেন?

আজ বিশ শতকের শেষ কার্নিসে এসে দাঁড়িয়ে, বাঙালি কবির সামনে আঞ্চলিক অভিমানের কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু, ভারতের অন্য ভাষাগুলির অভিজ্ঞতা, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রানুমোদিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আমাদের কোনও যথাযথ আলো দিতে পারবে বলে মনে হয় না। এই কৃশর-যজ্ঞের মহোৎসবে কোনও 'জাতীয়' সংস্কৃতিও গড়ে উঠবে না। অন্যভাষার মর্মসন্ধান প্রসঙ্গে জীবনানন্দ যখন বলেন, 'মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, বা হিন্দী কাব্য যদি এ বিষয়ে ফরাসি বা ইংরেজির স্থান নিতে পারত তাহলে জাতীয় সংস্কৃতির দিক দিয়ে জিনিসটা ঠিক হত', তখন জাতীয় সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ফর্মুলাকে ঠাট্টা করার

অভিপ্রায় তিনি গোপন রাখেননি। একটি প্রথম বন্ধনীর ভেতর, অব্যবহিত পরেই তিনি জানিয়েছেন, 'যদিও আমি জাতীয় সংস্কৃতির ওধরনের হিসেবে বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য মনে করি'।

তাই, বাংলার ছিন্ন দিগন্তে ভারতের পীড়িত-অপমানিত প্রকৃত মুখ ফুটিয়ে তুলতে গেলে, সে-চেষ্টাও আজ নিরাশ্রিত হতে বাধ্য। রাষ্ট্রের আনুকূল্যে রাজসভার কবি জন্মাতে পারেন, বাণিজ্যকেন্দ্রের সূতিকাগারে হাত-পা ছুঁড়তে পারেন কোনও হবু মিডিয়াম্যান। কিন্তু একজন জীবনানন্দকে সেই অক্টোপুসি দস্তানা স্পর্শ করতে পারে না। একজন ভারভারা রাও থেকে যান হাজতের অন্ধকারে।

শ্রাবণ ১৩৯৬

১. সম্পাদকীয়, *কৃত্তিবাস*, শ্রাবণ ১৩৬০
২. Comptroller and Auditor General of India
৩. *ইন্ডিয়া টুডে*, ৩১ মে ১৯৮৯, পৃ. ১৩২-৩৩
৪. রণজিৎ দাশ

গোপনে হিংসার কথা বলি

দিনকয় আগে এক বন্ধু'র প্রয়োজনে শহরের উপকণ্ঠে যেতে হয়েছিল কোনও এক জমিদালালের কাছে। ভদ্রোচিত বৈঠকখানায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের হাস্যকরোজ্জ্বাল তসবির টপকে চোখ অবধারিত চলে যায় দামি ফ্রেমে বাঁধানো একটি শংসাপত্রের দিকে - বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীযুক্ত অমুককে স্থানীয় যুবকবৃন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্য। নিচে ৩টি স্বাক্ষর - জেলাশাসক, পুলিশপ্রধান এবং মহামহোপাধ্যায় এক লোকসাহিত্যবিদ। মনে হ'ল, এ-অক্ষশক্তির জবাব নেই। রাষ্ট্রযন্ত্রের এই সাবেক প্রতিনিধিরাই আজও খেতাব বিলানোর কর্তা, সে সমাজসেবা হোক আর সাহিত্যসেবা! ব্যাঙাচিকে হাঙর বা সিন্ধুসারসকে আরশোলা বানাতে এদের জুড়ি নেই।

আগে রাজসভা থেকে যে-কাজ হ'ত, অর্থাৎ খেতাব বিলি বা গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত, এখন সে-জায়গাটা নিয়েছে স্পন্সরশিপ। কিন্তু পুঁজির ধর্মই হচ্ছে, শুধু উৎপাদনসম্পর্ক নয়, উৎপাদন-ব্যবস্থাটাকেও বদলে দেওয়া। রাজসভার বাজার নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না, রাজা এবং তার ছোট্ট স্তাবকগোষ্ঠীর চিত্তবিনোদনই ছিল যথেষ্ট। পুঁজি এইটুকুতে থেমে থাকতে পারে না। শুধু সভা নয়, সভার বাইরের অ-সভ্য সমাজকেও সে নিয়ন্ত্রণ করে।

রাজসভার আশ্রয় নিয়েও আগে যেমন মহৎ শিল্প-সাহিত্য হয়েছে, হয়েছে তাকে উপেক্ষা করেও। এবং একথা তো হাজার বার সত্যি যে, কোনও যথার্থ শিল্পীর সামনে কোনও সভাকক্ষ থাকে না। সমকালের সমস্ত ঘেরাটোপকে কাঁচকলা দেখিয়ে তিনি সেতু বাঁধেন মহাকালের দিকে। কৃত্তিবাস-আলাওলের আমলে অবশ্য পাঠকসমাজের ওপর রাজসভার কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাই তাঁরা রাজানুগৃহীত হয়েও গড়ে তুলেছিলেন একধরনের অভিপ্রেত স্বাধীনতা, যা শিল্পচর্চার জন্য এক জরুরি শর্ত। আবার হাল আমলে, বছর ২৫ আগে অবধি, ভঙ্গবাংলার এই পশ্চিমে সাহিত্যপুঁজি যখন ছিল জায়মান, তার ভঙ্গী ছিল সসম্ভ্রম। লেখকরা 'আনন্দযজ্ঞে' আমন্ত্রিত হলেও হবি-র আঁচে হাত না-পোড়ানোর স্বাধীনতা তখনও পর্যন্ত তাঁদের কথঞ্চিৎ ছিল। এখন?

শুধু আশ্রিত লেখকরাই আজ তার আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র নয়, বাংলাভাষার তাবৎ পাঠকসমাজকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, বহুলাংশে করছেও। একটি জাতির মগজে, অত্যন্ত মন্থর আর উপাদেয় কায়দায় সে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বিষাক্ত মাদক। একটি জাতির স্বপ্ন দেখার চোখ দিচ্ছে নিবিয়ে। একটি জাতির নান্দনিক চেতনা, ভাষাগত মূল্যবোধ আজ তাই বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে, যাঁরা অর্থ বা যশের জন্য ভাষার, সংস্কৃতির, শত্রুদের পংক্তিভোজে সামিল হয়েছেন,

তাঁদের জন্য আমাদের কোনও দুর্ভাবনা নেই। কিছু না-বুঝে-শুনে তাঁরা অবস্থান বেছে নিয়েছেন, এমন ভাবারও কোনও জরুরত নেই। কিন্তু কিছু কিছু বন্ধু আছেন, যাঁদের মনোভাবটা এইরকম - সাহিত্যসাধনা এক মহান ব্রত, কোথায় কে কখন কী কুকাজ করছে, এসব ছেঁদো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো মানে, নিজেকেই নীচে নামানো।

'স্বার্থও নহে, খ্যাতিও নহে, প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী' - একথা তো কেউ রক্তের গভীরে অনুভব করতেই পারেন। আগেই বলেছি, সেই অদৃশ্য মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়েই তাবৎ সৎ সাহিত্যের উৎসার। আর তা হ'ল, লেখকমনের এক নিঃসঙ্গ নিভৃত চর্যা। তাই বলে পাঠকসমাজের প্রতি তাঁর কোনও সামাজিক দায়িত্বের অবকাশও কি নেই, ঠিক সমাজকর্মীর মতো নয়, একজন সাহিত্যকর্মী হিসাবেই? অনাগত কালের পাঠক তো অব্যবহিতেরই ভবিষ্যপুরুষ। এই অব্যবহিত যদি বিলকুল ধ্বংসই হয়ে যায়, তবু হয়তো মানুষ আবার গড়ে নেবে কোনও নতুন সভ্যতা, যেমন নিয়েছে হিরোশিমায়। কিন্তু শ্রেয় কি নয়, এই বিলুপ্তির সম্ভাবনারই বিরুদ্ধে দাঁড়ানো? রবীন্দ্রনাথকেও একথা মনে করাতে হয়েছিল যে, 'সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে' বাসা বাঁধতে পারলে তবেই সাহিত্য 'আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিকভাবে আপনাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে পারে'। আজ সেই জাতীয় হৃদয়কেই যখন উচ্ছন্নে পাঠানোর আয়োজন চলছে, তার বিরোধিতার চেষ্টা করাটা কী এমন চুল ছিঁড়ে শাপ দেবার মতো অপরাধ!

এটা খুব স্বাভাবিক যে, আমরা আমাদের সমসাময়িক সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলিত হচ্ছি, পাঠকধ্বংসের মারণযজ্ঞের বিরোধিতা করছি। এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত ও ভর্ৎসিত হচ্ছি। এমনকি অত্যন্ত প্রিয়জনেরাও একে বলছেন 'মূল্যবিহীন কারণে শক্তি ও সম্ভাবনার সুদূরব্যাপী অপচয়'! যে-অমিতব্যয়ী কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অপচয়ের চোরাবালিতে পা দেয়, শুভার্থীর সদুপদেশও তার কানে ঢোকে না। তেমনই আবার উলটোদিকে, খরচের অঙ্কটা বড় ঠেকলেই, স্বভাবস্নেহশীল আত্মীয়েরা যে বেমক্কা আতংকিত হয়ে পড়েন, সেকথাও সত্যি। মূল্যবোধের হিসাব মেলাতে সেক্ষেত্রে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

অন্ধকারের নৌকো

প্রিয়তম সুহৃদদের সাথে এই বাদানুবাদেই কি আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করব? অতিপ্রিয় বন্ধুদের এই ছিন্নভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে আড়াল থেকে কেউ হাসে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই ভবিতব্য আমরা নিজেরাই রচনা করেছি আমাদের যার যার কর্মপদ্ধতির ভেতর দিয়ে। আজ আর সান্ত্বনার কোনও দিগন্ত নেই।

নেই বলা ভুল। সৎ কাজের মহৎ কাজের দৃষ্টান্তের আজও যে কোনও অভাব নেই, সেই তো আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা। এমন দুটি ভালো কাজের উল্লেখ না করলে অপরাধী থেকে যেতে হয়। প্রথম কাজটি করেছেন, শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্র গুপ্ত। যে-কাজ করার ছিল কোনও বিদগ্ধ বিদ্বৎমণ্ডলী বা ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থনবিভাগের, তিনি একাই তাঁর গভীর নিষ্ঠা আর উদ্যম নিয়ে গড়ে তুলেছেন একটি অসামান্য সংকলন – *আবহমান বাংলা কবিতা*। প্রকাশিত হয়েছে এর প্রথম পর্বটি, যাতে রয়েছে চর্যাগীতি থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত নির্বাচিত কবিতা। বাংলা কবিতার পাঠকদের হাতে এমন একটি সংকলন উপহার দেওয়ার জন্য আমরা মণীন্দ্র বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। আরও একটি অসাধারণ কাজ করেছেন, বন্ধু অরণি বসু। প্রয়াত কবি সুব্রত চক্রবর্তীর বেশ কিছু অগ্রন্থিত কবিতা, কবির মৃত্যুর ১০ বছর পর বিস্মৃতির গর্ভ থেকে তুলে এনে, অরণি প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

এইসব বিরল কাজই আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেয়। বুঝতে পারি, বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ এই ছোট ছোট উদ্যোগগুলির দিকেই উৎসুকভাবে তাকিয়ে রয়েছে। কোনও বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা নেই, সে-ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করার।

মাঘ ১৩৯৬

কীর্তিনাশা একটি নদীর নাম

কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে! তবু হয়তো, যেহেতু আমরা বেদনারই সন্তান, কিছু কিছু নাছোড় বেদনা আমাদের পিছু ছাড়ে না। আমরা ঘুমাই, আমরা জেগে থাকি, তাঁবু পুড়িয়ে চলে যাই জঙ্গলে, আবার হয়তো ফিরে আসি শহুরে হুল্লোড়ে, হট্টগোলের নাগরদোলার আড়ালেই হয়তো বানিয়ে নিই নির্জন দ্বীপ, আর চিৎপটাং হয়ে থাকি হাত-পা ছড়িয়ে, আবার। কিন্তু শিকারী কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেদনা হাজির হয় আমাদের ভ্রাম্যমাণ যেকোনও আস্তানায়। আসে, মুখ চুমরে, চোখ ঠেরে, জানান দিয়ে যায় - পালাবার কোনও রাস্তা নেই। আর, বেদনা যদি না-খুঁজে পায় আমাদের, হৃদয় খুঁড়ে আমরাই হায় জাগাই বেদনাকে। ভালোবাসি না জাগাতে, তবু। এইই আমাদের নিয়তি।

ঐ যে ঝলসে উঠছে জ্বলন্ত তর্জনীগুলি - অস্পৃশ্যেরা আবার ঢুকেছে জনপদে। নদীর বাঁকে দেখা যাচ্ছে ওদের ছোট্ট নৌকা। সংখ্যায় ওরা সামান্য। ওরা নিরস্ত্র। কিন্তু ওদের অস্তর ওদের চোখে। ওরা মৌচাকতন্ত্রকে মানেনি। না-মানার মধ্যে দিয়ে ওরা অপমান করেছে শৃঙ্খলাকে। আঘাত করেছে অমোঘতাকে। ওরা অসভ্য। বর্বর। জংলি। ওরা সন্ত্রাসবাদী। ওরা আবার এখানে কেন?

ঐ যে গর্জন ক'রে উঠছে বন্ধু-অবন্ধু কণ্ঠগুলি - ব্যর্থ মুষিকেরা আবার পাহাড় প্রসবের তামাসা নিয়ে এসেছে। ওদের ফেরাও। ওরা কি জানে না, কত বদলে গেছে এই পৃথিবী! সারি সারি অস্ত্রের ভাণ্ডার কীভাবে উৎখাত ক'রে দিতে পেরেছে শস্যের ভাঁড়ারগুলিকে। আফিমবিক্রেতাদের আখড়া থেকে কীভাবে বিলি হয়েছে স্বপ্নাদ্য কবচ। মন্ত্রমুগ্ধ এই ভিড় থেকে কে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে? কে শুনবে ওদের কাঁপা কাঁপা গান? ওদের গানগুলি পঙ্গু, পাণ্ডুর, ব্যর্থকাম। তাই ওরা হীনযান। ওরা লোভী। ষড়যন্ত্রী। ওরা আবার এখানে কেন?

ঐ যে ফিসফিস ক'রে উঠছে না-চেনা না-দেখা মুখগুলি - ওরা, ওরা কারা? নদীর বাঁকে ঐ যে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট নৌকা - ওদের কথাই কি শুনেছিলাম! ওরা জলদস্যু। মারো, ওদের মারো। নামতে দিও না জনপদে। কিন্তু ওদের হাতে তো কোনও অস্ত্র নেই। ওরা তুলে ধরছে ওদের দোতারা, বাঁশি আর মাদল। ওরা আসলে ভাঁড়। গানের ছদ্মবেশে ওরা পুন্নাম নরকে নিয়ে যেতে চায় তোমাদের। ওদের হাঁড়ির মধ্যে লুকানো রয়েছে দোজখের আগুনের মতো বিষধর সাপ। সুযোগ পেলেই ছেড়ে দেবে তোমাদের সাজানো আস্তাবলে। খবরদার... হোসিয়ার...

তবু বাতাস উঠে আসছে, ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে। পাক খেয়ে ফিরে যাচ্ছে হাওয়া, বঙ্গোপসাগর থেকে ডুয়ার্সের জঙ্গলের দিকে। হাওয়ার সেই ঘুর্ণিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে কত নাম-না-জানা রঙিন নিশান। রঙিন নিশানেরা বলছে - কীটনাশক চাই না আমরা, চাই না কোনও রাসায়নিক সার। সুসংহত কৃষিবিকাশ প্রকল্পের মহামান্য কর্মকর্তাদের আমরা সালাম করি। কিন্তু আমরা চাই জৈব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ। তারা বলছে - চাই না, ক্লোনিং চাই না। চাই না ছাঁচে ঢালা ঠান্ডা ঠান্ডা মিস্টি মিস্টি রাংতা-জড়ানো কথকতা। আমরা মাটিতে কান পাততে চাই। শুনতে চাই তার বুকের ভেতর কোন ধড়ফড়ানি ছটফট করে উঠছে অহর্নিশ। কীভাবে ধস নামছে খনির পেটে। ভাঙনের পর ভাঙনে কীভাবে তলিয়ে যাচ্ছে হাট-মাঠ গ্রাম-গঞ্জ। আমরা জানতে চাই সেই কীর্তিনাশার কথা।

কীর্তিনাশা একটি নদীর নাম। ওগো রঙিন রঙিন নিশানেরা, এই সেই নদী, যার সামনে ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখতে চাই আমাদের ভেঙে পড়া মুখ। সমস্ত অহংকার ধুলোয় লুটিয়ে পড়া সেই চেহারাগুলি দেখি, আর ভেসে আসে গর্জন। মিনার ভেঙে পড়ার গর্জন। সৌধ তলিয়ে যাওয়ার গর্জন। সময়ের, মহাসময়ের গর্জন। কীর্তিনাশা, সেই মহান কালপুরুষের নাম। তাঁকে আমাদের প্রণাম।

মাঘ ১৪০৮

ঘুম-ভাঙানিয়া ঘণ্টা শুনে একসাথে জেগে উঠতে পারে কয়েক শ' মানুষ। কিন্তু ঘুম আসার সময় মানুষ একলা। দিনের সমস্ত কোলাহলকে পিছনে ফেলে এসে, চোখ থেকে চশমা, মুখ থেকে মুখোশ নামিয়ে, ধীরে ধীরে নিজের ভেতর ঢুকে পড়ার সেই প্রাকৃত সময়ে, জ্যোৎস্নায় ঢেকে যাচ্ছে তার হৃদয়। আর নিস্তব্ধ পদক্ষেপে সে ক্রমেই ঢুকে পড়ছে এক গভীর অরণ্যে। নিস্তব্ধ, তবু শব্দ ফুটে উঠছে শুকনো পাতার শরীর থেকে, আর স্তব্ধতা বেড়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ। দূরের কোন জলাশয় থেকে ভেসে আসছে হরিণশিশুর কান্না, আর সে, একলা মানুষ, চলেছে সেই কান্নার দিকে, যেন এক সাঁতারভঙ্গিমায়, অকূল পাথার। কবিতার সাথে মানুষের সাক্ষাৎকারও অমন একাকিত্বে।

একাকিত্বের নমুনা দিতে ঘুমের নজির টানায় আপত্তি উঠতে পারে নানারকম। ঘুমের আগের একাকিত্ব মানুষকে ঘুমের দিকে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় চেতনার নিশ্চলতায়। কবিতাপাঠের একাকিত্বের পরিণতিও কি তাহলে একটি নিশ্চিন্ত নিদ্রা! এই উদ্বেগের সারল্য ও সততার সামনে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি, যেখানে চরাচর ও মনোভূমি স্পষ্টতই শুক্লে-কৃষ্ণে দ্বিভাজিত। মধ্যবিন্দুর একপ্রান্তে থাকে গুমোট অন্ধকার, শ্বাসরুদ্ধ দরবারি কানাড়া, নিশ্চলতা, একাকিত্ব, ঘুম - যার বর্ণ কৃষ্ণ, ধর্ম অশুভ, গোত্র নেতি। আর অন্যদিকে ফিকে আলোয় রিনরিন করা বাতাস, আহির ভৈঁরো, সক্রিয়তা, সমিতি, জাগরণ - বর্ণ শুক্ল, ধর্ম শুভ, গোত্র ইতি।

এই দ্বিধা থেকে কবিরাই উদ্ধার করেন, যখন দেখি আমাদের এক কবি বলে রেখেছেন - ঘুম এক স্নান। তাহলে ঘুম শুধু ঘুমিয়ে পড়াই নয়, তা এক চিকিৎসাও বটে। ক্লান্ত, শিথিল, যাপনের চাপে ধ্বস্ত স্নায়ুগুলিকে পুনর্জীবিত করার এক আনন্দিত অবগাহন। যার গভীর থেকে উঠে আসে আমাদের স্বপ্নগুলি, আমাদের শপথ ও প্রতিজ্ঞাগুলি, প্রেম আকুতি ও হাহাকারগুলি। উঠে আসে। এসে আবার হারিয়েও যায় হয়তো। কিন্তু তার করুণ আভা সঞ্চিত হয়ে থাকে চোখের তারায়, ভ্রূপল্লবে, কেঁপে ওঠা ঠোঁটের অস্ফুট ভাষায়।

হ্যাঁ, কবিতা তো এইটুকুই পারে। একা একা, চুপি চুপি, একলা কোনও মানুষের কানে কানে সেই কথাটা শুনিয়ে যেতে পারে সে - কোথায় যেন যে-কথাটা আগেই শুনেছিলাম, অথচ ভুলে গেছি বেমালুম। সেসব কথা নিয়ে একটু চাপা ফিসফাস-কানাকানি চলতে পারে, বড়জোর ছোট্ট একফালি আড্ডা। কিন্তু সমবেত জাগরণের ঘণ্টাকর্ণ ভূমিকায় সে আমর্ম ব্যর্থ। শব্দের শরীর দিয়ে স্তব্ধতার আত্মাকে

স্পর্শ করতে চাওয়ার আকুতিকে যদি কবিতা মনে করি, তবে ভিড়ের কাছে সে অপ্রতিভ, এমনকি পর্যুদস্ত।

আমাদের চেনাজানা ফর্দে অমন ব্যর্থতার সর্বোত্তম নমুনা হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবিনাম জপ করতে করতে ভক্ত বাঙালি যেমন একে অন্যের পেটে ছুরি চালিয়ে বিভক্ত হয়ে গেল, তা যেন, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু ইত্যাদির ঢাকি-ঢুলি সমেত বিসর্জন! আর ৭/৮টা শ্রাবণ মাস বেশি বাঁচলেই ঠাকুরমশাই স্বয়ং সে-কেচ্ছা দেখে যেতে পারতেন। রবিগানে মাতোয়ারা বাঙালির কানে তো শরৎ বসু আবুল হাসিম-এর আকুল আহ্বান পৌঁছল না! বরং তারকেশ্বর থেকে যখন হুঙ্কার উঠল, পাকিস্তান না হলেও বাংলাকে দু'ভাগ করতে হবে, তখন বাংলার মাটি বাংলার জল গাওয়া কলকাতার হিন্দু খবরকাগজগুলো কী ভূমিকা নিয়েছিল? আজ সেই আকাঙ্ক্ষিত পশ্চিমে খোকাবাবুর কোনও প্রত্যাবর্তন ঘটবে না। কারণ যে-নদীতে সে গড়িয়ে পড়েছিল, তা ইতিমধ্যেই একটি বিদেশী নদী। আর হ্যাঁ, বনলতা সেন? তিনিও তো বিদেশিনী! সোনার বাংলা গাইতে গাইতে নাটোরের অসহায় কয়েক ঘর সংখ্যালঘুর বাড়িতে লুঠপাট চালিয়ে, কয়েকটি মেয়েকে বলাৎকার ক'রে, বিজয় উৎসব পালন করল আর এক দল কবিতাভোজী বাঙালি ১৪০৮। রূপসী বাংলা? হুঃ!

দেখুন মশাই, কবিতা লিখে কিস্যু হয় না। আগুন জ্বালানোও যায় না, নেবানোও যায় না। তবু দুর্ভিক্ষে পড়া মানুষ যেমন পেটের দায়ে কুখাদ্যও খায়, কবিতাও, অভুক্ত আত্মার সেরকম এক বিষপথ্য। বিষে বিষক্ষয় হ'ল তো ভালোই, নইলে যে-মৃত্যু অবধারিতই ছিল, তা আরও একটু পার্থিব হয়ে উঠবে মাত্র। গুজরাটে আগুন জ্বলতেই থাকবে, মানুষ মরতেই থাকবে, আর তাকে ভবিতব্যের মতো মেনে নিয়ে টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদী কবিতাপাঠের নিরুপায়তা আর কতদিন, বন্ধুরা?

বৈশাখ ১৪০৯

ধনেশ পাখির হাড়

বাংলার মুখ আমি দেখি নাই, তাই... ৩১
বিনি পয়সার ভোজ ৩৪
যুক্তাক্ষর-এর গদ্য ৩৬
হায় রে ইন্ডিয়ার কবি! ৫৩
ধনেশ পাখির হাড় ৫৬

বাংলার মুখ আমি দেখি নাই, তাই...

১.

গত বছর একটি গণ্ডার কীভাবে যেন গরুমারা জঙ্গল থেকে জলপাইগুড়ি শহরে ঢুকে পড়েছিল। মানুষ তার ভয়ে ছুটছে, আর সেও ছুটছে মানুষের ভয়ে। ছুটতে ছুটতে করলা নদীর তীর ধরে সে এসে পৌঁছাল ব্রহ্মতরপাড়া গ্রামে। পেছনে তখনও ধেয়ে আসছে পুলিশ আর বনরক্ষীর তাড়া। সামনে যে বিষণ্ণ প্রকৃতি, তার আঁচলের নকশায় কোনও তারতম্য নেই। গাছের পাতা, নদীর জল, মাটির রঙ, মানুষের ভাষায় কোনও ফারাক নেই। বেচারা গণ্ডার কিছু না বুঝেশুনেই সেঁধিয়ে গেল আরও ভেতরে, সীমান্তের ওপারে। সে তো জানত না, রাষ্ট্রনায়কেরা চার দশক আগেই এই অফুরন্ত নিসর্গের মাঝখানে বসিয়েছেন এক অদৃশ্য কাঁটাতার। কাজেই, যেকোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর মতোই তাকে পাকড়াও ক'রে আবার ফেরত আনা হ'ল 'দেশে'। চারদিক ঘেরা আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত সেই গণ্ডারটি শেষ অবধি মরেই গেল। তখন সে ছিল গর্ভিনী।

২.

আমাদের এই গ্রহে এখন বাংলাভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা নাকি প্রায় ২০ কোটি। ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে যার স্থান পৃথিবীতে পঞ্চম।

আমরা, পশ্চিমবাঙালিরা, যখন বাংলা সাহিত্যের হাল হকিকত নিয়ে আক্ষেপ/অনুরাগ প্রকাশ করি, তখন বেমালুম ভুলে যাই, স্বভাষী সাহিত্যচর্চা শুধু এই ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়। পূর্বদিকে তা আরও বহুদূর বিস্তৃত। মানচিত্র ছিঁড়ে যাবার সুবাদে ভাষার উত্তরাধিকারও যে এভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, এটাই বোধ হয় বাংলাভাষীর জীবনে সবচেয়ে মর্মান্তিক ট্রাজেডি। অবশ্য নিরক্ষরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই বেদনার বোধকে হয়তো অনেকটাই ভোঁতা ক'রে রেখেছে। কিন্তু তৃষ্ণার্ত পাঠকের সংখ্যাও তো পুব-পশ্চিম-ঈশানে কিছু কম না।

তবু, এপারের লেখালিখি ওপারে যাচ্ছে। বিশেষ ক'রে কলকাতাকেন্দ্রিক পণ্যসাহিত্যের উদ্গাতারা তাদের প্রকাশনাগুলো অবাধে ওপারে বাজারজাত ক'রে চলেছে। কিন্তু ওদিকের সাহিত্যচর্চার সামান্যতম নমুনাও এদিকে নিয়ে আসতে তাদের হাত কাঁপে। যে-কারণে তারা পশ্চিমবাংলার প্রকৃত লেখকদের রচনাপাঠের সুযোগ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করে, সেই একই আতঙ্ক থেকে, ভুলেও তারা বাংলাদেশের কোনও শক্তিমান লেখকের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না। অথচ, বিশেষত গদ্যের ক্ষেত্রে, গত ১৫-২০ বছরের বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা ওপারেই রচিত হয়েছে।

হাল আমলের কথা পরে। আমরা তো ওয়ালিউল্লাহের রচনাবলীই হাতের কাছে পাই না। অথচ বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান এই গদ্যকারের সৃজনশীলতার শুরু তো কলকাতাতেই। তাঁর *লালসালু* উপন্যাসটি এখানেই রচিত ও প্রকাশিত (১৯৪৮)। *নয়নচারা* গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছিল *পূর্বাশা* থেকে, আরও আগে (১৯৪৪)। আবু ইশহাকের *সূর্যদিঘল বাড়ি*-র প্রথম প্রকাশও কলকাতায়। বিভাগপূর্ব এই লেখকদেরই যখন আমাদের খণ্ডিত 'সাহিত্যের ইতিহাস' বর্জন করেছে, সেখানে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা শওকত আলীর মতো পরবর্তী লেখকেরা হালে পানি পাবেন কী ক'রে? অথচ *চিলেকোঠার সেপাই* বা *প্রদোষে প্রাকৃতজন*-এর মতো মৌলিক গ্রন্থগুলি অপঠিত থাকলে ক্ষতি তো আমাদেরই। এই বইগুলি পশ্চিমবাংলায় প্রচারিত হ'লে এখানকার পণ্যসাহিত্যের ভুসির দুর্গ ভেঙে পড়বে।

প্রবন্ধনিবন্ধ, গবেষণামূলক রচনা, পরিভাষা ও অভিধান সংকলনে তো বটেই, সৃজনশীল সাহিত্যের অন্যান্য দিকেও আন্তর্জাতিক মানের বহু কাজ বাংলাদেশে হচ্ছে, যার ন্যূন্যতম খবরটুকুও আমাদের কাছবরাবর পৌঁছাচ্ছে না। কলকাতায় আজও আমরা জর্মন থেকে অনুবাদ ক'রে নাটক মঞ্চস্থ করি। সেটা খারাপ কিছু না। কিন্তু ভাবুন, বাংলা নাটক জর্মন ভাষায় অনুদিত হয়ে বার্লিন শহরে অভিনীত হচ্ছে! হ্যাঁ, মামুনুর রশীদের *ওরা কদম আলি* নাটকটি এই সম্মানের অধিকারী। বাঙালি হিসাবে গর্বিত হওয়ার মতো এই ঘটনাটি কিন্তু এদিকের নাট্যমহলেও তেমন প্রচারিত হয়নি। মামুনুর ছাড়াও সৈয়দ শামসুল হক (*নুরলদীনের সারাজীবন, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*) বা সেলিম আল দীনের (*কীত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল, হাত হদাই*) নাটকগুলি যেকোনও ভাষার অহংকার। এর ভেতর কয়েকটি নাটক কলকাতাতে অভিনীতও হয়েছে।

৩.

প্রিয় পাঠক, লক্ষ ক'রে থাকবেন, কবিতা বিষয়ে এখনও কোনও উচ্চবাচ্য করিনি। একথা অস্বীকার করব না, ১৯৯০-এর আগে অবধি এপারের কবিতা নিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন উন্নাসিকতা আমার মধ্যেও কাজ করত। কিন্তু সম্প্রতি ওপারের তরুণ প্রজন্মের একগুচ্ছ কবির রচনার সাথে সামান্য পরিচিত হতে পেরে সে-অহংকারও চূর্ণ হয়েছে। সেই সূত্রে অপরিচয়ের বেদনাবোধও তীব্র হ'ল।

মাথাভাঙা তো কলকাতা থেকে কত দূর। কিন্তু এমন একটা অবস্থা কি কল্পনা করা যায় যে, নিছক দূরত্বের কারণেই আমরা নিত্য মালাকারের মতো কবির অস্তিত্বের কথা জানলাম না, বা পুরুলিয়ার নির্মল হালদারের কথা। অথচ অবস্থাটা সেরকমই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যখন ফরহাদ মজহারের *এবাদতনামা*

আমাদের হাতে আসে, বা তরুণতর সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের *তনুমধ্য*। যখন আমরা যশোরের দারা মাহমুদ, বগুড়ার মাসুদ খান, শ্রীমঙ্গলের জুয়েল মাজহার, ঢাকার ফরিদ-দুলাল-তুষার-কাজল বা সদ্যতরুণ ব্রাত্য রাইসু-আদিত্য কবির-সাজ্জাদ শরিফের কবিতা পড়ি, তখন নিশ্চিত হতে পারি বাংলা কবিতার ভূগোল আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

৪.

রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতার অন্ধ কাঁটাতারে মাথা ঠুকে, বাংলাভাষী পাঠকের পরিণতি কি শেষ পর্যন্ত গরুমারা জঙ্গলের ঐ নিরীহ গণ্ডারটির মতো হবে?

জর্মনি, ভিয়েতনাম, কোরিয়া বা ইয়েমেন - মাটি ভাগ হলেও, সাহিত্যের ইতিহাস বা ঐতিহ্য কোথাও দু'টুকরো হয়েছে বলে শুনিনি। সেই ভয়ংকর ভবিতব্যের বিরুদ্ধে শুধু বাঙালিরাই নিরুপায় দর্শক হয়ে রইবে - এটা হতে পারে না।

সংস্কৃতি আর সাহিত্যের উত্তরাধিকারে পৃথিবীর ২০ কোটি বাঙালি এক ও অবিভাজ্য।

বৈশাখ ১৩৯৭

বিনি পয়সার ভোজ

সে অনেক দিন আগের কথা। এক পেল্লায় জঙ্গলে ছিল এক শেয়ালদের দেশ। সে দেশের মন্তর ছিল - হুক্কা হুয়া। অর্থাৎ, সব শেয়াল সমান। সাদা, পাটকিলে, হলুদ, নানান বরন শেয়াল। কেউ পুব দিকে মুখ ক'রে গজ়ল গায় তো কেউ পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে ঠুংরি। কিন্তু এক মন্তরে সবাই খামোশ - হুক্কা হুয়া।

এই শেয়ালরাজ্যের রাজাগজারা কিন্তু তাই বলে শেয়াল ছিল না । তারা সব ছিল বাঘ। বাঘ হ'লে হবে কী, সবাই থাকত শেয়াল সেজে, আর ডাক পাড়ত - হুক্কা হুয়া। রোগাপটকা শেয়ালগুলোর ঘাড় মটকে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। কেউ কোনওরকম সন্দেহ করলেই শেয়াল-সাজা সেই বাঘের দল ডাক ছাড়ত - হুক্কা হুয়া।

এইভাবে দিব্যি চলছিল। কিন্তু কালে কালে কলিকাল এল। শেয়ালদের খাজনা কেবল বাড়ছে। আর খাবার যাচ্ছে কমে। বাচ্চা শেয়ালদের ঘাড় মটকে হররোজ নাস্তা সেরে যাচ্ছে কোন অপদেবতার দল! অবস্থা যখন এমন, কিছু মাথাগরম শেয়াল ধিরে ধিরে বেঁকে বসতে লাগল। তারা কানে কানে বলে বেড়াতে থাকল, আমাদের খাবারে ভাগ বসানো চলবে না। বলে বেড়াতে লাগল, দেখেছ, রাজা-গজা-আমির-ওমরা-নাজির-উজিরদের গায়ে কেমন বাঘ বাঘ গন্ধ! এদের হটাও।

এদিকে বাঘরাজাও বুড়ো হয়েছে। সে-ও আর পেরে উঠছে না। সেই মওকায় একটি ছোকরা বাঘ খুবই দাপুটে হয়ে উঠেছে। সে ভাবে, বুড়োবাঘের বোকামিতে বাঘেদের রাজত্ব এইভাবে বেফালতু ভেঙ্গে যাবে! ছোকরা বাঘ আর সইতে পারে না। কিছু শেয়ালকে জড়ো ক'রে সে বোঝাতে শুরু করে - দ্যাখো ভাইসব, আর জন্মে তোমরা সবাই ছিলে বাঘ। আর বাকি শেয়ালগুলো ছিল স্রেফ একেকটি ভেড়া। তোমরা হলে গিয়ে বাঘা শেয়াল। আর ওগুলো সব ভেড়ুয়া। তোমাদের যা কিছু সমস্যা, তা বিলকুল ঐ ভেড়ুয়াগুলোর জন্য। ওদের মারো, নইলে খেদিয়ে দাও পাশের জঙ্গলে। কিছু শেয়াল হাঁক পেড়ে ওঠে - জয় শ্রী বাঘ!

বুড়ো বাঘের অনেক সাঙ্গপাঙ্গও তলে তলে যোগ দেয় ছোকরা বাঘের দলে। বুড়ো বাঘ প্রমাদ গণে আর প্রাণপণে চেঁচায় - হুক্কা হুয়া।

ছোকরা বাঘ ভাবে, এই হ'ল সময়। নিকুচি করেছে এই শেয়ালের ছদ্মবেশ আর হুক্কা হুয়া মন্তরের। যা ভাবা, সেই কাজ। জঙ্গলের মাঝখানে ছিল কোন আদ্যিকালের এক বাঁশবাবার মাচান। ছোকরা গিয়ে লাথি মেরে আঁচড়ে কামড়ে প্রথমে সেই মাচানটা ভাঙল। তারপর ছিঁড়ে ফেলল শরীরে চাপানো শেয়ালের সাজ আর জঙ্গল কাঁপিয়ে ডাক ছাড়ল - হালুম। আওয়াজ শুনে, এক দল শেয়াল আকাশের দিকে লেজ তুলে সবাই মিলে ধ্বনি দিল - জয় শ্রী বাঘ!

তারপর? তারপর আর কী! শেয়ালে শেয়ালে মারামারি হ'ল একচোট। জঙ্গলের সবুজে লাগল রক্তের ছোপ। জমে উঠল বাঘেদের বিনি পয়সার ভোজ।

বৈশাখ ১৪০০

১.

কবি টি এস এলিঅট এপ্রিলকে বলেছিলেন, নিষ্ঠুরতম মাস। কিন্তু বাঙালির কাছে আগস্টের মতো রক্তাক্ত, মর্মছেঁড়া, আত্মবিনাশী মাস আর কী হতে পারে! প্রিয় পাঠক, আমরা স্পষ্টতই এমাসের ১৫ সংখ্যক লাল হরফের তারিখটির অনুষঙ্গে কথা বলছি। ৪৭ বছর আগে রাডক্লিফ সাহেবের ছুরিতে যেদিন ছিঁড়ে গিয়েছিল আমাদের মানসজগতের মানচিত্র।

সেই সুদূরপ্রসারী ক্ষতের দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ওঠার পক্ষে ৪৭টি বছর অবশ্য কম নয়। আজ এতদিন পরে, আমাদের দৈনন্দিনে, স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহের জমপেশ মোচড়ে, আমাদের শিল্প-রাজনীতি-খেলার প্রতিভায়, সেদিনের অপস্মৃতির ছিটেফোঁটা তাড়নাও আর নেই। বিশেষ ক'রে, বিভাজনপরবর্তী প্রজন্ম, বাপ-দাদাদের মতো কোনও মেদুর নস্টালজিয়ার আক্রমণ থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত। হাজার বছরের একাত্ম ইতিহাসকে অতীতের একটা খসে যাওয়া অধ্যায় বলে পাশ কাটিয়ে, আমরা দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছিলাম।

এমন সময়ে, অক্টোবর ১৯৯০তে অযোধ্যার ঘাড়ের ওপর প্রথম দফা গেরুয়া হানা। ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পারস্পরিক তাণ্ডব। এবং, সীমান্ত টপকে অশান্তির ঢেউ ছোবল মারল বাংলাদেশেও। অবশেষে ৯২এর ৬ ডিসেম্বর। বাবরি গুঁড়োল, সারা ভারত স্তব্ধ হয়ে গেল দাঙ্গার উৎসবে। এবং, পুনশ্চ ভয়াবহ জের গড়াল বাংলাদেশে। চোখের সামনে দেখলাম, সীমান্ত দুটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল মাত্র। একই সূচে এফোঁড় ওফোঁড় করা দুটি অভিশপ্ত আত্মার মতো, ইতিহাসের চাপিয়ে দেওয়া ভূত আমরা এখনও ঘাড় থেকে নামাতে পারিনি।

ঘটনা যখন এই, একই আগুনে পুড়তে পুড়তে, একে অন্যের দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছি আমরা। বিপরীত অভিমুখে ছুঁড়ে দেওয়া আমাদের আর্তনাদ মহানীলিমার বুকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে যেন আমাদেরই পস্পরকে বিদ্রূপ করে। অথচ আমাদের ভাষা এক, সংস্কৃতিও। রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতার অনিবার্যতাটিকে মেনে নিয়েও, ভাবনা বিনিময়ের একটা বিরাট ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে আমাদের সামনে। আদানপ্রদানের এই শুভপ্রক্রিয়াটি যে একেবারেই গরহাজির তা বললে মিথ্যে বলা হবে। বাংলাদেশের নাট্যদল-সংগীতশিল্পী-চিত্রকরেরা তাঁদের সাম্প্রতিক কাজ নিয়ে এখানে আসছেন। ঢাকার ফুটবল খেলয়াড়রাও দিনকতক খেলে গেছেন কলকাতা ময়দানে। কিন্তু, চিন্তাচেতনার যে-প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি ছাপার হরফে ধরা পড়ে, যেকোনওভাবেই হোক, তা রয়ে গেছে আড়ালে।

বাংলাদেশের দিক থেকে দেখলে, ছবিটা অবশ্য উলটো। এপারের পাঠ্য-অপাঠ্য, রঙিন-সাদাকালো, বাণিজ্যিক-নিরীক্ষামূলক সব ধরনের লেখারই সাগ্রহ সংগ্রহের চর্চা রয়েছে সেখানে। অথচ, এদিক থেকে যেন কোনও অদৃশ্য পাঁচিল তুলে রেখেছি আমরা। একেবারে হালের দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া।

প্রসঙ্গত, আদানপ্রদান কিন্তু চালু রয়েছে চোরাচালানিদের ভেতর, মৌলবাদীদের মধ্যেও হয়তো।

এই যোগসূত্রহীনতা থেকেই গড়ে ওঠে এক ভ্রান্ত মূল্যায়নের পরিবেশ। ঢাকার মৌলবাদীদের মিছিলের দৃশ্য প্রথমপৃষ্ঠার ছবি হয় কলকাতার কাগজে। কিন্তু ঘাতক-দালাল-নির্মূল কমিটির লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ তেমন গুরুত্ব পায় না। মৌলবাদের বিরুদ্ধে সদ্যপ্রয়াত জাহানারা ইমামের একাগ্র নির্ভীক লড়াইয়ের প্রতিবেদন এখানে উপস্থাপিত হয় না। রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত তাঁর সপক্ষে কলম ধরতে দেখি না কাউকে। সেখানকার অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ধারাবাহিক সংগ্রামের সামগ্রিক রূপটি সম্পর্কে সচেতনতার এই অভাব, প্রকারান্তরে সেখানকার মৌলবাদী শক্তিগুলিকেই যে শক্তিশালী হবার সুযোগ করে দেয়, একথাটা বোধ হয় আমরা ভেবেও দেখিনি। বাংলাদেশের মানুষের তরফেও একইরকম বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে হয়তো।

তাই, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-সমাজভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'পারের সৃজনশীল মানুষ কীভাবে সক্রিয়, তা একটি মলাটে তুলে ধরা এ-সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায় বলে আমরা মনে করছি। শুধু পশ্চিমবাংলা আর বাংলাদেশই নয়, বরাক উপত্যকা এবং ত্রিপুরার বাংলাভাষী মানুষের নিরাশা-প্রত্যাশার কথাও আমরা জানতে চাই। একই সাথে আন্তর্জাতিক ঔৎসুক্য আর বাংলার শিকড়সন্ধান আমাদের সমন্বিত অন্বিষ্ট।

আগস্ট ১৯৯৪

২.

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই আমরা ভয় পাই না।

জঙ্গি ইসলামি মৌলবাদীদের এই স্লোগানটি দেখে, প্রিয় পাঠিকা-পাঠক, আপনি কি আমাদের প্রতি ঈষৎ সন্দিহান হয়ে পড়ছেন? আচ্ছা, 'আল্লাহ' শব্দটি বদলে ওখানে তবে বসিয়ে দিন 'ভগবান'। কী, এবার কি একটু সহনীয় মনে হচ্ছে বাক্যটি? চেনা চেনাও লাগছে যেন!

এই যে একটি মাত্র শব্দের পরিবর্তনে একটা বাক্যের ব্যঞ্জনা এইভাবে পালটে গেল, এ তো কোনও শিল্পিত কারিগরি মাত্র নয়। মানি বা না-মানি, এর

পেছনে কাজ করছে আমাদের সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা। কখনও কখনও যখন আমাদের রাষ্ট্র-সমাজ-রাজনীতি এক ঝটকায় খুলে ফেলে তার ধর্মনিরপেক্ষাতার মুখোশ, আমরা বিহ্বল হই। কিন্তু আমরা, যারা নিজেদের যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ বলে ভাবতে ভালোবাসি - তারাও কিন্তু মাঝে মাঝে উলটো পথের চোরাস্রোতে ভেসে যাই। এর জন্য হয়তো আমরা নিজেরাও সবসময়ে দায়ী নই। প্রজন্মবাহিত না-বিশ্বাসের বীজ কোনও এক অন্ধকার কোণে ঘুমিয়ে থাকে। অসময়ের অনুকূল হাওয়ায় গজিয়ে ওঠা তার তরুণ চারাটিকে দেখে প্রথমে আমরা চিনতেই পারি না। এরই ভেতর সর্বশক্তিমান প্রচারমাধ্যম কখনও গৃহস্থকে সজাগ হ'তে বলে, কখনও আবার চোরকে উস্কিয়ে দেয় চুরিতে।

যেমন ধরা যাক, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে একাগ্র সৈনিক হিসাবে কলকাতার প্রচারমাধ্যম যখন শ্রীমতি তসলিমা নাসরিন-কে তুলে ধরল, তখন নারীমুক্তি আন্দোলনের ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হ'ল। জনমনে ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম - দেখেছ, একটা মুসলমানের মেয়ে কেমন লিখেছে! সেই প্রচারের ঢলে অত্যন্ত প্রগতিশীল মানুষের মধ্যেও জেগে উঠল একটি 'হিন্দু'-মন। এই প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করার জন্য কিন্তু ভুলেও উচ্চারণ করা হ'ল না বেগম রোকেয়ার নাম। বিশ শতকের গোড়ার দিকে দাঁড়িয়েই এই মহিয়সী ব্যক্তিত্ব নারীমুক্তির স্বপক্ষে যেভাবে কলম ধরেছিলেন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যে-ব্যাকুল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস আমরা সযত্নে ভুলে যেতে দিয়েছি।

তারপর বিস্ফোরিত হ'ল *লজ্জা*। হিন্দু মৌলবাদীরা সেটি সঙ্গতভাবেই লুফে নিয়েছিল। কিন্তু আমাদেরও প্রচ্ছন্ন 'হিন্দু'-মন কি বইটি পড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেনি! অযোধ্যার কলঙ্কচিহ্নে যাদের দম বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল, *লজ্জা* যেন এক বিরাট স্বস্তির বাতাস হ'য়ে বয়ে এল। সমস্ত অপরাধবোধ থেকে মুক্তি, সমস্ত জবাবদিহির দায় থেকে মুক্তি - ভারতেও হয়েছে, বাংলাদেশেও হয়েছে, শোধ বোধ। তাই বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা কৌতূহলীই হলাম না। ভুলে গেলাম এ-প্রশ্ন করতে, যে, একটি প্রকৃত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী রচনাকে কি কোনও মৌলবাদী শক্তি কখনও বিপরীত অভিপ্রায়ে কাজে লাগাতে পারে? সমরেশ বসু, ওয়ালিউল্লাহ বা সাদাত হাসান মান্টোর অনুরূপ রচনাগুলি তবে এতবছর ধরে মৌলবাদীদের হাতে অব্যবহৃত রয়ে গেল কীভাবে!

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা - ধরনের কোনও মনোভাব আমাদের নেই। কারণ আমাদের কাছে তসলিমা, মহল্লার সেই দুষ্টু মেয়েটির মতো, যে ভিমরুলের চাকে একটি ঢিল ছুঁড়ে বা ঘুমন্ত পাগলা কুকুরের লেজে একটি জ্বলন্ত ফুলঝুরি বেঁধে দিয়ে, দে চম্পট। ঢিলটি ছোঁড়ার বা ফুলঝুরি বাঁধার চপল

সাহসের জন্য 'দুষ্টু মেয়ে' তারিফযোগ্য। কিন্তু মহল্লায় যাঁরা ভিমরুলের চাকটি ওপড়াতে বা পাগলা কুকুরটিকে খেদানোর জন্য জোট বাঁধছিলেন, তাঁদের অবস্থাটা চিন্তা করুন একবার। 'দুষ্টু মেয়ে'র পাওয়া হাততালির বিনিময়ে তাঁদের বরাতে যে জুটবে উন্মত্ত দংশন, সেটুকু ভেবে দেখার অবকাশও পেলেন না তিনি।

স্রেফ হাততালি পাওয়ার লোভে অনেকে আজকাল নায়াগ্রার উদ্দাম প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, বা আকাশের দিকে মুখ ক'রে ঘণ্টায় ১৭৫৭টি ডিম খাচ্ছেন। এইধরনের কৃতিত্ব গিনেস-কেতাবের পৃষ্ঠা ছাপিয়ে মানবসভ্যতার কোন্ কাজে আসবে কে জানে! কিন্তু তসলিমার যশোলিপ্সা যে আখেরে বাংলাদেশের মাটিতে মৌলবাদের ভিতকেই শক্তিশালী করল, আর তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতেও, সেটাই আমাদের বেদনার জায়গা। বিষয়টি এইজন্য আরও উদ্বেগের যে, পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম এক গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গোটা ঘটনাপরম্পরাকে ব্যবহার করে চলেছে, যার প্রভাব এই উপমহাদেশে সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

এক জটিল সময়গ্রন্থির ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে আমাদের ইতিহাস। কোনও একমাত্রিক সিদ্ধান্ত তার স্বরূপকে বোঝার জন্য পর্যাপ্ত নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের নানামুখী পরিচর্যার টানাপোড়েনই হয়তো বুনে তুলতে পারে তার আগামী আঁচলের নকশা। তাই নানা ভিন্ন মতের উপস্থাপনেই আমরা সমৃদ্ধ হতে চাই। প্রিয় পাঠিকা-পাঠক, আপনাদের সকলেরই সৃজনশীলতার আমন্ত্রণ রইল সেই আত্ম-আবিষ্কারের পথে।

অক্টোবর ১৯৯৪

৩.

পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষই নাকি একাধিকবার ভোররাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে টাইগার হিলে দৌড়ে গিয়েও কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফের মুকুটে লাল আলোমাখা সূর্যোদয়ের বিখ্যাত দৃশ্যটি দেখতে পাননি। নেপালের সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর, হিমালয়ের কোল থেকে ঠিকরে পড়া সেই আলোর আভা এসে অনেককেই খুশি ক'রে তুলেছে দেখা গেল। কলকাতার কাগজগুলোয় কদিন ধরে যে-গুরুত্ব দিয়ে এই নির্বাচনের পটভূমি, ফলাফল ও তার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হচ্ছিল – মনে হচ্ছিল, যেন কোনও ঘরোয়া ভোটপর্বেরই খবর পড়ছি আমরা। এখানকার শাসক বামপন্থীরা তো ছোটখাটো একটা বিজয়উৎসবই ক'রে ফেললেন!

নেপালের হালফিল এই খবরে এখানকার মানুষের খুশি হবার কারণ রয়েছে বই কি। প্রতিবেশী জাতিসত্তাগুলির মধ্যে নেপালিরা আমাদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ জাতি। নেপালি ভাষা পশ্চিমবাংলায় সরকারিভাবে স্বীকৃত একটি ভাষা।

নেপালি কবি ভানুভক্তের নামে পুরস্কার চালু রয়েছে এখানে। সর্বোপরি রয়েছেন সুভাষ ঘিসিং, যিনি অবশ্য পশ্চিমবাংলার নেপালিদের গোর্খালি বলে দাবি করেন।

এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও নেপাল এবং নেপালিদের সম্পর্কে আমরা কিন্তু আমাদের হামবড়াই স্বভাবমাফিক দীর্ঘদিন উদাসীনই ছিলাম। বছর চারেক আগে, পৃথিবীর বহু জায়গায় যখন ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে, রানাশাহীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানে নেপালের মানুষ জয় ক'রে আনলেন এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। পৃথিবীর একমাত্র ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্রের এই মানুষেরা তখন থেকেই আমাদের সমীহ আদায় ক'রে নিয়েছেন। তারপর, মাত্র চার বছরের ব্যবধানে, বামপন্থীদের সমর্থনে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এই রায়, আমাদের আর একবার মনোযোগী ক'রে তুলল।

প্রায় সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের মুখ থুবড়ে পড়ার পর নেপালের আকাশে স্পন্দিত লাল নিশানগুলি সমাজতন্ত্রের কোনও নতুন বিজয় সূচিত করছে কি না, আমরা জানি না। বাজার অর্থনীতির মোকাবিলায় বিকল্প কোনও নমুনা পেশ করার দাবিও নেপালের নতুন নায়কদের কাছে নেই। তবু যে আমরা তাঁদের অভিনন্দিত করব, সে শুধু এই মুগ্ধতা থেকে, যে একটি রাজতান্ত্রিক ধর্মরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাঁরা অন্তত ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। ভারতের মাটিতে যারা হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার খোয়াব দেখছিল, নেপালের বামপন্থীদের এই জয় যে তাদের আশাহত করেছে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এই জয় শুধু হিন্দু মৌলবাদের চোয়ালেই একটি জোরালো থাপ্পড় মাত্র নয়, ইসলামি মৌলবাদের প্রতিও এ এক সতর্কবাণী। বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের মতো জন্মসূত্রে ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্রকে যারা ইসলামি রাষ্ট্র বানাতে চাইছে, তাদেরও বেজার হবার কারণ যথেষ্ট।

নেপালে বামপন্থীদের এই আংশিক জয়ের পেছনে জাতীয়তাবাদেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। নেপালি জনগণের এই জাতীয় চেতনার উন্মেষে কাজ করেছে, তাঁদের বিচারে, ভারতের সঙ্গে নেপালের কয়েকটি অন্যায্য চুক্তি। ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল শান্তি মৈত্রী চুক্তির ৭ম ধারার বিলুপ্তি তাঁদের একটি প্রধান দাবি। এই ধারা মোতাবেক দুই দেশের মানুষের দুই দেশে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ রয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, ভারতীয় নাগরিকদের অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহে নেপালের জনবিন্যাসে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতে বাংলাদেশীদের অভিবাসন নিয়ে হালে যে শোরগোল উঠেছে, কোনও কোনও মহল থেকে যাকে অনুপ্রবেশ আখ্যা দেওয়া হয়, দেখা যাচ্ছে, নেপালে ভারতীয় নাগরিকদের অনুরূপ অভিবাসন তাহলে বৈধতাপ্রাপ্ত!

আবার, ১৯৬৫ সালের এক চুক্তি মোতাবেক, ভারতের অনুমতি ছাড়া নেপাল কোনও অস্ত্র আমদানি করতে পারে না। নেপালের গত নির্বাচনের একটি

জনপ্রিয় দাবি ছিল, এই চুক্তিটি বাতিল করা। তবে, নেপালি কমিউনিস্টদের ক্ষমতাসীন হতে যা সবচেয়ে সাহায্য করেছে, তা হ'ল, মহাকালী নদীর ওপর টনকপুরে বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী কৈরালা, সংসদের অনুমোদন ছাড়াই ভারত সরকারের সাথে এ নিয়ে একটি চুক্তি করেছিলেন। যার ফলে ভারতের এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় এই নদীবাঁধটি নেপালি সীমান্ত টপকে সেদিকের নদীকেও শৃঙ্খলিত করেছে। বিনিময়ে ঐ প্রকল্পে উৎপাদিত বিদ্যুতের একটি ভাগ নেপাল পাবে। এই চুক্তি নেপালি মানুষকে বেজায় ক্রুদ্ধ ক'রে তোলে। তাঁরা বলেন, যে-সরকার নদী ভাগ করতে পারে, তারা ভারতের কাছে দেশকেও বিলিয়ে দিতে পারে অবলীলায়। এমন কি সাবেক শাসক দল নেপালি কংগ্রেসের সদস্যরাও এতে ক্ষুব্ধ হন। নেপালের বামপন্থীরা এই সবকটি ক্ষেত্রেই জনগণের প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেন। ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেও, তাঁরা চান এইসব একতরফা চুক্তিগুলির পুনর্বিবেচনা বা বিলুপ্তি। নতুন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন অধিকারী স্পষ্টই বলেছেন - আমরা সব দেশের জন্য একইরকম নিয়মের পক্ষপাতী। ভারতের জন্য কোনও স্বতন্ত্র অনুবিধি আমরা চাই না।

এখানে যাঁরা নেপালের বামপন্থীদের জয়ে উল্লসিত, তাঁরা এইসব দাবিগুলি সম্পর্কে এখানকার মানুষকে কতদূর ওয়াকিবহাল করছেন, জানা নেই। যাঁরা আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক অবরোধে পড়া কিউবায় চাল পাঠানোর মহৎ উদ্যোগ নেন, প্রতিবেশী দেশগুলির মানুষের গণতান্ত্রিক দাবিগুলির বিষয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবনাচিন্তাশীল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিটির কথা। এবিষয়ে এখানকার গণতান্ত্রিক শক্তির নীরবতা যে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের কণ্ঠকেই জোরদার করেছে, তা হয়তো আমরা বুঝিনি। বাংলাদেশের মানুষের ভারতসরকার-বিরোধী যেকোনও উচ্চারণকেই মনে করেছি সাম্প্রদায়িকতা বা দক্ষিণপন্থার বহিঃপ্রকাশ। নেপালের কমিউনিস্টদেরও কি আমরা সেই আখ্যা দেব?

ডিসেম্বর ১৯৯৪

৪.

আরশোলারা নাকি প্রকৃতির অনেক জব্বর বাধা টপকে একটা লম্বা সময় জুড়ে টিকে আছে। এমন কি, ক্লিন্টন সাহেব না করুন, পৃথিবীতে যদি আজ দু'একটা পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটে যায়, ঘনিয়ে আসা সেই ধ্বংসসময়ের মধ্যেও অন্ধকার গলিঘুপচিতে মুখ গুঁজে এই প্রাণীটি নাকি পার পেয়ে যাবে। এসব কথা শুনলে,

আরশোলার মতো তুচ্ছ (?) জীবের প্রতিও কেমন যেন ভয়মেশানো শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে।

একথা মানতেই হবে, আগুনের আবিষ্কার থেকে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা অবধি যত তাক-লাগানো কীর্তিই ফেঁদে বসুক না কেন, প্রাণী হিসাবে মানুষ ঢের পলকা। স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য ৪-৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার হেরফেরে আজও আমাদের দেশে, বাংলায়, গরমে ঠান্ডায় প্রতি বছর কিছু মানুষ মারা যান। তবে হ্যাঁ, মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব বেঁচে থাকে। এই বাঁচাটা তাকে বাঁচতে শিখিয়েছে তার ভাষা। চিন্তা করার যে-আশ্চর্য যোগ্যতায় মানুষ অন্যান্য জানোয়ারের চেয়ে আলাদা হয়ে উঠেছে, মগজের সেই বিশেষ সক্রিয়তার অবলম্বনই হ'ল তার ভাষা। এই দিক দিয়ে ভাবতে গেলে, ভাষা তার অস্তিত্বেরই সমার্থক। তাই, মন থেকে তার ভাষাকে মুছে দিলে, তার মানুষিক সত্তার অপঘাতমৃত্যু সহজ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে-ভাষা হাজার বছর ধরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, তাকে কি টপ ক'রে মুছে দেওয়া যায়। যায়। নইলে লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকার লেখকদের ভাষা আজ স্প্যানিশ বা ইংরেজি কী ক'রে? ওসব দেশে কি নিজেদের ভাষা কোনও কালে ছিল না! অদ্দূরে না-ই বা গেলাম। আমাদের ঘরের কাছের মগধ অঞ্চলের ভাষা একদা ছিল মাগধি, যার আধুনিক নাম মাগহি। সময়ের ঢেউ লেগে ঐ মাগধি থেকেই নাকি হাজার বছর আগে পূর্বভারতীয় ভাষাগুলো গড়ে উঠেছিল। তো এমন একটা ভাষা আজ কিছু প্রবীণের জবানে টিমটিম ক'রে টিকে থাকলেও, নতুন প্রজন্মের মানুষেরা সবাই এখন সকারিভাবে হিন্দিভাষী। মনে রাখতে পারি, মাগধিটা কিন্তু মানুষের মুখে মুখে পালটে কালক্রমে হিন্দি হয়ে ওঠেনি। স্রেফ সরকারি প্রতিপত্তির বশে একটা জনগোষ্ঠীর ভাষা বেমালুম পালটে গেল!

কিন্তু এসব কথা এখানে উঠছে কেন? এখানে তো কারও ভাষাকে কেড়ে নেওয়ার মতো কোনও আইন জারি হয়নি। হয় যে নি, সেটাই তো কর্তাদের এলেম। আইন না চাপিয়েই যদি কাজ চলে যায়, বরং আরও মসৃণভাবে? তোমার প্রতিটি ঘরের কোনে, প্রতিটি শিশুর মনে, যদি জ্ঞান হওয়া ইস্তক ঢুকিয়ে দেওয়া যায় আমার মনমতো ভাষা, তবে আইন জারির দরকারটা কী? তোমরা তোমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্যের গর্ব নিয়ে থাকো। ভূত আমার পুত পেত্নি আমার ঝি, রবীন্দ্রনাথ বুকে আছে করবে আমায় কী - এই মন্তর জপ করতে করতে গুরুদেও-য়ের দাড়ির চেয়েও তোমাদের লেজ মোটা হয়ে উঠুক। আর আমরা নীরবে তোমাদের নিরাপত্তাবলয়ের মতো ওই দাড়ি থেকে একটা একটা ক'রে রোম ছিঁড়ে ফরসা ক'রে দিই। আমাদের সুপারহিট মুকাবিলার ফটাফট ধামাকার কয়েকজোড়া লাথিতে সত্যিই আজ পাপোষে লুটোচ্ছে তোমাদের ঐ খণ্ডবিখণ্ড রচনাবলী।

কিন্তু অতীতেও তো কত না রাষ্ট্রিক বিপর্যয় ঘটেছে। এসেছে বিভিন্ন ভাষার দরবারি জৌলুশ। তাতে কি লুপ্ত হয়ে গেছে নাকি আমাদের ভাষা! না, লুপ্ত হয়নি। চর্যাপদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী অন্ধকারেও ভাষা বেঁচে ছিল, কৃষক-কারিগরের মুখে। বেঁচে ছিল, কারণ চণ্ডীমণ্ডপে-টোলে-আখড়ায় অষ্টপ্রাহরিক টিভি-সংকীর্তনের কোনও দূরতম ছায়ারও অস্তিত্ব ছিল না। আরও পরে, ব্রিটিশদের থাবা ছিল বটে আরও বজ্র-আঁট। কিন্তু প্রতিপত্তির মাধ্যম তখনও ছাপার হরফ। তাই শাসকদের দমনপীড়ণ সংহিতার পাশাপাশি হাজির রইল তাদের সাহিত্যের ভাঁড়ার। আর আজ? একটি আলোকিত চৌকো বাক্সের ভেতর দিয়ে চোখ বেঁধে যে-ভাষাপৃথিবীর বধ্যভূমিতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ঘন্টার পর ঘন্টার সেই মগজধোলাই শিক্ষাক্রমের সামান্যতম সাহিত্যমূল্যও নেই।

কাজেই ভাষা বাঁচবে না। যদি না আমরা তাকে বাঁচাই। এখন তাহলে ফিরে যাই সেই ছোট্ট আরশোলাটির কাছে। আর ফিসফিস ক'রে জেনে নিই – কী হে, কীভাবে টিকে আছ তুমি এতদিন, এত ডিডিটি-বেগনস্প্রের আক্রমণ ঠেকিয়ে? ফিসফিস করেই সে বলবে – লড়াই ক'রে। আমরা কি শিখে নিতে পারব আক্রমণ ঠেকানোর সেই অমানুষিক প্রতিভা? আমরা কি একটা অত্যন্ত সামান্য দাবি তুলব? – কোনও মামার বাড়ির আবদার করছি না আমরা। আমাদের বাংলায় ৯০ শতাংশ মানুষ বাংলাভাষী। দূরদর্শনের ৯০ শতাংশ অনুষ্ঠান আমরা বাংলাতেই চাই।

মে ১৯৯৫

৫.

প্রতি মুহূর্তে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে যত কথা আমরা বলছি, ভাগ্যিস সেসব কথা একজোট হয়ে কানের পর্দায় ধাক্কা মারে না! তার যেটুকু ভগ্নাংশ টের পাই, তাতেই মনে হয়, আকাশঢাকা কথার এক অরণ্যে পথ হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এক তালগোল পাকানো কথার মণ্ডের ভেতর দম আটকে যাচ্ছে মগজের। তখন মনে হয় নীরবতাই বুঝি ভালো। শোনার মতো কান আর বলার মতো কথার অভাবে কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসে হৃদয়।

তবু, কথা না বলেও তো আমরা পারি না। কোনও শ্রোতা নেই জেনেই, তখন হয়তো শুরু হয় নিজের উদ্দেশ্যে স্বগতকথন। একটু একটু ক'রে গড়ে নেওয়া সেই সংলাপের শুরুতেই আমরা দেখি, কেমন বিবর্ণ হয়ে ঝলসে গেছে রোজ-আওড়ানো আপ্তবাক্যগুলি। পৃথিবীর ধারাবাহিক যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে যেমন অর্থহীন হয়ে ঝরে পড়ে শতাব্দীপ্রাচীন শান্তিবচনের কংকাল। বিশ্ববিবেকের রঙিন বেলুনটি কত

অনায়াসেই না চুপসে যায় বসনিয় শিশুর নিথর হয়ে যাওয়া স্বপ্নে। কাশ্মীরের শিশুরাও কি স্বপ্ন দেখে আর? দেখলেও, সে-স্বপ্নের ভাষা কি আমরা বুঝি!

সভ্যতার আগ্রগতির গুজবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাজার হাজার মানুষ আজও আগাছার মতো মরে, পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘটে যাওয়া জাতিদাঙ্গা-গোষ্ঠীদাঙ্গাগুলোয়। হুতু বনাম তুতসি, মোহাজির বনাম সিন্ধি, শিয়া বনাম সুন্নি, হিন্দু বনাম মুসলিম, নাগা বনাম কুকি, এমসিসি বনাম লিবারেশন! অন্ধ উগ্রতায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে নয়ানাৎসিরা। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পঞ্চাশ বছরের উৎসবের পাশাপাশি, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের অধীন একটি বামপন্থী সরকারের পুলিশি হেফাজত থেকে লোপাট হয়ে যায় চটকল শ্রমিক ভিখারি পাসোয়ান।

ভাবা যেতে পারে, প্রজন্মবাহিত অভিজ্ঞতার আলোতেই মানুষ কালক্রমে নানান আপ্তকথার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে, এক মানবিক পৃথিবীর কামনায় স্বস্তি পেতে চেয়েই হয়তো দীর্ঘশ্বাসে ভেঙে পড়া মানুষ ওই সরল আশাবাদের কথাগুলি বানিয়েছে। ভেবেছে, চরাচরব্যাপী এই অন্ধকার কোনও শেষ কথা নয়। হয়তো নয়। কিন্তু সে কি কোনও ঈশ্বরের বিধানে বা ইতিহাসের গতিচক্রের আমোঘতায়? বিশ্বাস করা শক্ত। মানুষ যদি না তার ইতিহাসকে পাল্টায়, ঈশ্বর কিংবা ইতিহাসের ঊর্ধ্বতন চৌদ্দপুরুষের ক্ষমতা নেই তাকে নতুন চেহারা দেবার। আর কে না জানে, মানুষ কত না দুর্বল প্রাণী। সে শুধু খেয়ে পরে ঘুমিয়ে গান গেয়ে সন্তানের শুভকামনায় দিনগুলি কাটিয়ে যেতে চায়। চায়, কিন্ত পারে না। এই তার নিয়তি।

তার নিয়তিই তাকে অজস্র কথার ভিড়ে একদিন নির্জন করে তোলে। নিজের সাথে কথা বলায়। তার সামনে তখন ভেসে ওঠে এক আগামী নদীর দর্পণ। বাতাসে কাঁপতে থাকে তার ছায়া, আর কথা দিয়ে দিয়ে সে জুড়তে থাকে তার মুখ। ছায়ার সাথে খেলতে খেলতে সে যেন গড়ে তোলে নিজেকেই। গড়ে তোলে তার ইতিহাস। একটি মুখের আভা ছড়িয়ে পড়তে চায় সহস্রে। একটি কথার ঢেউয়ে নেচে উঠতে চায় লক্ষ।

আর, এইসব গল্পের শেষে সে প্রতিবার বলে ওঠে সেই সাতকেলে শ্লোকটি : আমার কথাটি ফুরোল / নটে গাছটি মুড়োল। কথা ভাগ্যিস ফুরোয় না। ফুরোয় না বলেই, আবার কখনও শুরু হয়ে যায় সোনার কাঠির ছোঁয়া-লাগা ঘুম-কেড়ে-নেওয়া রূপকথাগুলি, সব্বার অজান্তে।

জুলাই ১৯৯৫

৬.

দিন কয়েক আগে একটি বহুপ্রচারিত বাংলা দৈনিকে আধপাতা জোড়া একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। বিজ্ঞাপনটি ছিল সম্ভবত কোনও বুদ্ধির টনিক(!)-এর। আবেদনের ধরনটি ছিল এরকম : আপনার প্রিয় সন্তান পড়াশোনার চাপে দিশাহারা? তার মগজের শুশ্রূষার জন্য এই অব্যর্থ দাওয়াইটি... । টনিক খেলে টনক নড়ে কি না, সে-প্রশ্নের সামনে অবশ্য আমরা হোঁচট খাইনি। গলা খুসখুস থেকে মন উসখুসের যাবতীয় উপশম যে বিজ্ঞাপন মারফত জুটে যায়, এ-সত্য তো আজ প্রশ্নাতীত। আমাদের বিমূঢ়তার জায়গাটা একটু আলাদা। কথিত বিজ্ঞাপনটির দিকে আমাদের চোখ টেনেছে একটি বালকের ছবি। তার সারা শরীর এক সর্পিল শেকলে জড়ানো। শেকল অবশ্য লোহার নয়। একটির পর একটি পাঠ্যবিষয়ের ভার শৃঙ্খলিত ক'রে আছে তাকে – অঙ্ক, ইতিহাস, ভৌতবিজ্ঞান, ইংরেজি, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান, হিন্দি ইত্যাদি। হিন্দি? হ্যাঁ হিন্দিই। বালকের পাঠ্যসূচিতে বাংলার কোনও স্থান নেই। উল্লেখ্য, বিজ্ঞাপনটির ভাষা ছিল বাংলা। প্রকাশিতও হয়েছিল একটি বাংলা দৈনিকেই।

পশ্চিমবাংলার বাংলাভাষী ক্রেতাসমাজের উদ্দেশ্যে প্রচারিত ঐ বিজ্ঞাপনটি থেকে বাস্তবতার সম্ভাব্য দুটি চেহারা ধরা পড়ে। ১. এখানকার ইস্কুলপড়ুয়াদের পাঠ্যসূচিতে বাংলা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়। অন্তত ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার দাপটে পড়ুয়াকে কুপোকাত হয়ে টনিকের শরণ নিতে হবে। বরং সেই জায়গা দখল করেছে হিন্দি। ২. বাংলা হয়ত পাঠ্যসূচি থেকে এখনও পুরোপুরি নির্বাসিত নয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতারা ভালোই জানে, তেমনটা হলেও এখানকার বাঙালির কিছু যায় আসে না। বাঙালির কক্ষপথ এতটাই আন্তর্জাতিক, হৃদয়মন এতটাই সংকীর্ণতামুক্ত, যে তাকে কেউ বাঙালি বলে সম্বোধিত করলেই বরং সে অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়। ইস্কুল পাঠক্রমে বাংলা গেল কি হিন্দি এল, এসব ছেঁদো ব্যাপারে মাথা ঘামানোর মতো সময় বা রুচি কোনওটাই তার নেই।

বাস্তবতার যে-চেহারাটাই সত্যি হোক, স্বস্তি পাবার মতো হয়তো কোনওটাই নয়, যদি না আমরা স্বেচ্ছায় একটি বিলুপ্ত প্রজাতি হয়ে উঠতে চাই। মাতৃভাষা আর স্বজাতিসত্তার প্রতি যদি নিজেদের মমত্ব না থাকে, তবে বাইরের কোনও শক্তিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ক্ষমতার স্বভাবই হচ্ছে নিজের কোলে ঝোল টানা। আমাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসন যখন ভাষাগতভাবে হিন্দিবলয়ের কুক্ষিগত, তখন তাঁরা যে তাঁদের ভাষা সমস্ত রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইবেন, এর মধ্যে আর আশ্চর্যের আর কী আছে! হয়তো প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি দেশে এমনটা হওয়া উচিত ছিল না। সেই অনুচিতকে ঔচিত্যে আনতে গেলেও অবশ্য নড়েচড়ে বসতে হয়। কিন্তু আমাদের নিজেদের হাতে স্বাধীন চলাফেরার যে-জায়গাটুকু রয়েছে, সেখানেই বা আমরা গত ৪৯ বছরে কী করলাম?

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর (১৯৬১) সিদ্ধান্ত ছিল পশ্চিমবাংলায় সমস্ত সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহারের। কতটুকু এগোতে পেরেছি আমরা!

অবশ্য হালে পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত সমস্ত যানবাহনের নম্বর বাংলায় লেখার যে-সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। কিছু কিছু গাড়িতে ইতিমধ্যেই বাংলা হরফের বোর্ড নজরে পড়েছে। 'ডব্লিউ' দিয়ে শুরু করা সেই বোর্ডগুলি লিখতে রঙের কারিগরদের অবশ্য মেহনত বেড়ে গেছে। বাংলা নম্বর অনায়াসেই প.ব. দিয়ে শুরু করা যায়। আর কেনই বা যাবে না? উত্তর প্রদেশের নাম যদি নর্থ প্রভিন্স না হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গকে খামোখা কেন অনুদিত হয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল হতে হবে?

মার্চ ১৯৯৬

৭.

পেটের ভাত পরনের কাপড়ে যত টানই পড়ুক, সাতশ' মজার এক মজা না জুটলে আমাদের দিন কাটে না। অভাব অনটন দুঃখ কষ্ট তো রয়েছেই। তাই বলে মুখ শুকনো করে, চোখ কোটরে ঢুকিয়ে শোকপালন করতে হবে নাকি! পৃথিবীর দিকে দিকে কত দুধ-ঘি-মাখনের ছড়াছড়ি, কত না সাড়ে বত্রিশ ভাজা থরে থরে সাজানো। সেসব নয় থাকলই আমাদের নাগালের বাইরে। তাই বলে বাজনা-বাদ্যিতে আমরাই কি কম যাই? একমাস ধরে ক্রিকেট জগঝম্পের শেষ হতে না হতেই, ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল পঞ্জিকার তিথিনক্ষত্র মিলিয়ে।

আত্মপ্রেমিক বলে আমাদের নাম রটে বটে, কিন্তু বালির নিচে বয়ে চলা লুকানো নদীর মতো আমাদের দেশপ্রেমের খবর কেউ রাখে না। না রাখল, না-ই রাখল। তাতে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। মন্ত্রপূত হাতিয়ার যেমন, যেখানে সেখানে বের করতে নেই। অনেক বুঝে শুনে, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় চালাতে হয় - আমাদের দেশপ্রেমকেও আমরা তেমনি এলেবেলে জায়গায় খরচ করতে পারি না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, এমনকি পাহাড়ে চড়া বা সমুদ্রে সাঁতরানোর মতো ঘটনা নিয়ে আমাদের অহমিকার কোনও বেলুন কখনও ফুলে ওঠে না। কিংবা হয়তো উঠতে চাইলেও, কারা যেন আলপিন ফুটিয়ে বেলুনগুলো চুপসে দেয়। কাজেই আমাদের গর্বের আমাদের অহঙ্কারের আমাদের অস্তিত্বের শেষতম ঘোষণার জন্য পড়ে থাকে টিভিপর্দায় ফুটে ওঠা একটুকরো মাঠ। এগারটি সিংহের বাচ্চার পায়ে আমরা সঁপে দিই আমাদের ইজ্জতের সওয়াল। আমরা চিৎকার করি আর ফেটে পড়ি। যে-পতাকা আমরা ছুঁয়েও দেখি না অন্য সময়ে, আমাদের হাতে হাতে গর্জন করে ওঠে সেই রাষ্ট্রীয় ধ্বজা। আজ

আমরা সৈনিক। সমস্ত শিরা টান টান, ইন্দ্রিয় প্রখর, জয়ের আনন্দে ঝলসে ওঠার জন্য উন্মুখ। আর হেরে গেলে? একটানে ছিঁড়ে নিতে হবে দুশমনের মুণ্ডু, উপড়ে নিতে হবে শয়তানের চোখ, শত্রুকে বুঝিয়ে দিতে হবে –

শত্রু? শত্রু আবার কারা? যেসব দেশের সাথে খেলার ময়দানে মুখোমুখি হচ্ছি আমরা, তারা? না না, তা কেন! পৃথিবীর কোনও দেশের সাথে তো আমাদের কোনও লড়াই ঝগড়া নেই। শুধু ঐ একটা দেশ, যার নাম মুখে আনলেও পায়ের রক্ত মাথায় উঠে আসে। আর আছে আমাদের ঘরের শত্রুর ঝাড়। যারা খাবে পরবে এখানে, আর পতাকা নাড়বে পড়োশির। আমাদের যাবতীয় সুখ শান্তি সমৃদ্ধির একমাত্র পথের কাঁটা ঐ ওরাই। সব কটাকে মেরে দেশ থেকে তাড়াতে পারলে, তবে আমাদের অক্ষয় পুণ্য। তখন আমাদের এগিয়ে যাওয়া রোখে কে!

আসে একটার পর একটা মেলা মচ্ছব। ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ হয়ে আমরা মেতে উঠি, আর ভাবি, ঐ ঘরের শত্তুরদের সাথে একটা হেস্তনেস্ত করার কথা। এর চেয়ে বড় দেশপ্রেম, এর চেয়ে বেশি রাজনীতিসচেতনতা আর কী হতে পারে? রাজনীতির মঞ্চ যখন খেলার ময়দান হয়ে দাঁড়িয়েছে, খেলার ময়দানেই তাই শুরু হয় আমাদের রাজনীতির প্রদর্শনী। আর, এ তো কোনও ঘরোয়া দলাদলি, ভোট কামড়াকামড়ির ব্যাপার নয়, এ একেবারে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চর্চা। এইভাবে দেশপ্রেম দিয়ে শুরু করে বিশ্ববোধের দুয়ারপ্রান্তে পৌঁছে যাই আমরা।

এখন খেলা শেষ। কাঠি পড়েছে ভোটের ঢাকে। তাঁবুতে তাঁবুতে নতুন কলি ফেরানোর কাজ এখনও চলছে পুরোদমে। শুরু হবে চিৎকার। বাগ্মিতা প্রতিযোগিতার তোড়ে কার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে কীসব বেফাঁস কথা। সেসব অবিশ্যি আমরা গায়েও মাখি না, মনেও রাখি না। আমরা শুধু ভাবতে থাকি, কোন রথের চাকা থেকে রাঙা ধুলো উড়বে কোন প্রান্তে। কোন পদ্মের বীজ কখন ছড়িয়ে দেবে ধুতুরার নেশা। অমনি আবার আমরা প্রস্তুত। প্রস্তুত আমাদের দেশপ্রেম। সামান্য ইঙ্গিতেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ব লড়াইয়ের ময়দানে। ঐ যে ওরা, ঘাপটি মেরে ছড়িয়ে আছে আমাদেরই আনাচে কানাচে। সুযোগ পেলেই এমন শিক্ষা দেব বাছাধনদের, যে টের পাবে আমরা এখনও মরিনি।

পুনশ্চ : একদিন একপ্রস্ত ঝগড়াঝাটির পর একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল – তোমার মতো মেয়েমানুষের পুড়ে মরাই উচিত। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই তাদের বাড়িতে আগুন লাগল। আর মানুষটির আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার স্ত্রী সেদিন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেল। অনুতপ্ত মানুষটি এসে দাঁড়াল তার গুরুর কাছে। গুরু বললেন, এমন অভিশপ্ত জিহ্বা স্তব্ধ হোক। ইহুদি পুরাণের এই কাহিনিটি এখানে উদ্ধৃত থাকল।

এপ্রিল ১৯৯৬

৮.

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ইতালির পথে পথে হয়তো বেজে উঠেছিল জলপাই কাঠের এস্রাজ। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে রোমানো প্রাদি'র যে-মধ্যবাম জোট সেদেশের নির্বাচনে জয়ী হ'ল, তার নামটি ভারি অদ্ভুত - জলপাই গাছের জোট। ইতালির মতো একটা খাস ইয়োরোপীয় দেশে বামপন্থীরা ক্ষমতার ভাগ পেতে চলেছে দেখে, কারও হয়তো আহ্লাদ হয়েছে খুব, কারও বা চোখ উঠেছে কপালে।

কিন্তু সে-নির্বাচনের দু'হপ্তা যেতে না যেতে ইতালির সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম কেড়ে নিলেন সম্পূর্ণ অন্য মেরুর এক রাজনীতিবিদ - উমবের্তো বস্সি। যুক্তরাষ্ট্রীয় ইতালির দাবিদার বস্সির আঞ্চলিক দল নর্দার্ন লিগ উত্তর ইতালিতে সক্রিয়। দেশের সমৃদ্ধতর এই উত্তর অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের জন্য লিগের লড়াই। উত্তর অঞ্চলে লিগের সাফল্য এতই নিরঙ্কুশ, যে এবারের নির্বাচনে ইতালির মোট ভোটের ১০% তাদেরই বাক্সে ঢুকে গেছে।

এই সাফল্যে হয়তো বস্সির মাথা গরম হয়ে গেছে ভাবতে পারেন কেউ কেউ। নইলে হঠাৎ ক'রে তিনি উত্তরাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা চেয়ে বসেন কোন্ আক্কেলে! দলের স্বঘোষিত 'উত্তরের সংসদ'-এ বস্সি ঘোষণা দিলেন - রোমে আমাদের নিজস্ব বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবার গড়ে ফেলা যাক আমাদের নিজস্ব সরকার। চেকোস্লোভাকীয় পথ বেছে নেওয়ার সময় হয়েছে এবার - দেশটাকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আসুন গোলটেবিলে বসে পড়ি।

বস্সির এই ঘোষণায়, স্বাভাবিকভাবেই ছিছিঃকার পড়ে গেছে ইতালিতে। দেশের রাষ্ট্রপতি, বিদায়ী দক্ষিণ এবং হবু জলপাই-বাম প্রধানমন্ত্রীরা, সংবাদমাধ্যম - কেউই মেনে নেননি বস্সির আবদার। কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার, বিকেন্দ্রীকরণ আর দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তা মেনে নিতে সকলেই রাজি।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পূর্বশর্তই হ'ল, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র তো নৈর্ব্যক্তিক কিছু নয়, তা ক্ষমতাপ্রবণ মানুষেরই নিয়ন্ত্রণে। ক্ষমতার স্বভাবই হ'ল যে তা সমোচ্চশীলতা বরদাস্ত করে না। কাজেই পুঁথি-কেতাবে যাই থাক, অত্যন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও কেন্দ্রাভিগ শক্তি কখনও কখনও নগ্নভাবে জেগে ওঠে। কখনও কখনও কেন্দ্র হয়ে ওঠে গ্রানাইটের মতো জমাট, বজ্রের মতো আঁটোসাটো। সেই বজ্র আঁটুনির বিপ্রতীপ ক্রিয়ায় প্রান্তিক শক্তিগুলিও আবার মাথা চাড়া দেয় আকুল আবেগে।

আদর্শগতভাবে, কেন্দ্র আর প্রান্তের এই সমস্যা, একটি আধুনিক রাষ্ট্রে, বিচার বিতর্ক আপোশ মীমাংসার পথ ধরেই চলার কথা। কিন্তু বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলির সমস্যা যেন আরও জটিল। যে-বৈচিত্র্য আর বহুস্বর এই ধরনের রাষ্ট্রগুলির প্রকৃত প্রাণশক্তি হয়ে উঠতে পারে, রাষ্ট্র সেই বহুত্বকেই সন্দেহ করতে আরম্ভ করে। বড় অঞ্চল ছোট অঞ্চলের ওপর চেপে বসে। ক্ষমতাশীলের ভাষা-

সংস্কৃতি ক্ষমতাহীনের ভাষা-সংস্কৃতির পথ অবরোধ ক'রে দাঁড়ায়। কখনও আবার সংখ্যাগুরুর ধর্ম চোখ রাঙায় সংখ্যালঘুর ধর্মকে। আর এই রাষ্ট্রীয় সর্বগ্রাসকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য তুলে ধরা হয় ভুয়া আত্মপরিচয়ের দর্শন।

এই রাষ্ট্রিক এককেন্দ্রিকতার নিকৃষ্টতম উদাহরণ পাওয়া যায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে। সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে রুশ আধিপত্যবাদের উগ্রনখ সেখানে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলির বিকাশের পথ রুদ্ধ করে তুলেছিল। তাই ক্রেমলিনের গম্বুজ থেকে লাল পতাকা খসে পড়তেই একের এক প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে রুশদের শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

এখানেই শেষ নয়। আজকের রাশিয়াও একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র, রুশ ফেডারেশন। রুশ ছাড়াও তাতার, কশাক, চেচেন, এরকম বহু জাতিসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে। ককেশাস পাহাড়ের উত্তর পাদদেশের চেচেনরা এখন রুশদের কব্জা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। রাশিয়ার মতো একটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি ছোট্ট জাতিসত্তার এই অসম যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন ঝোখর দুদায়েফ। গত ২১ এপ্রিল মধ্যরাতের এক রুশ বিমানহামলায় নিহত হলেন তিনি। একটি নিপীড়িত জাতির মুক্তিযুদ্ধের এই নায়ককে আমরা নদীমাতৃক বাংলার শ্যামল শ্রদ্ধা জানাই।

মে ১৯৯৬

৯.

সুদূর মহাকাশ থেকে হঠাৎ হঠাৎ নানারকম ব্যাখ্যাতীত তরঙ্গ এসে ধরা পড়ে পৃথিবীর নানা গবেষণাঘরে। আলোবছর দূরের কোনও নক্ষত্রলোকে বুদ্ধিমান প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠেন বিজ্ঞানীরা। একদিন হয়তো সত্যিই বঙ্কুবাবুর বন্ধু কোনও য়্যাং-এর টোকা পড়বে মানুষের দরোজায়। কিন্তু আত্মঘাতী যুদ্ধে মানুষ নামের প্রজাতিটাই ততদিনে লুপ্ত হয়ে যাবে না তো! এখন তো আর যুদ্ধ কোনও রাষ্ট্রবিশেষের বা তাদের জোটের সীমানায় আটকে নেই। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বরফ-সমুদ্র-মরুভূমি-জঙ্গলে ঘেরা এই গ্রহের সর্বত্র। বলতে গেলে সারা পৃথিবীরই সামরিকীকরণ ঘটে গেছে ছোট ছোট গৃহযুদ্ধ মারফত। জ়ায়ের থেকে আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা থেকে চেচনিয়া – বিশাল ব্যাপ্ত এই রণাঙ্গন। সংখ্যাহীন মানুষের মৃত্যুর পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি। এরই পাশাপাশি রয়েছে ক্ষুধার্তদের গণহত্যা। এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত খাদ্যের নাগাল পায় না পৃথিবীর নানা প্রান্তের ৮০ কোটি মানুষ। তবুও যুদ্ধই আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ক্ষুধা বা দারিদ্র্য কোনও সমস্যাই নয়। তাই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে

যেসব চুক্তি হয়, তার সিংহভাগ জুড়ে থাকে সামরিক চুক্তি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্যবসায়িক চুক্তি। অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের বিষয়গুলির গুরুত্ব, দুনিয়ার এইসব মুরুব্বিদের কাছে ছিটেফোঁটা।

কবি বলেছেন - হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন। দুনিয়া জোড়া এই সমর-কূটনীতির রমরমায় ভারতই বা পেছিয়ে থাকে কেন! অস্ত্রশস্ত্রের বাজারের এক বড়সড় খদ্দের হিসাবে তার কৌলীন্যও তো কিছু ফেলনা নয়। রুশ-ভারত চুক্তি বা ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির মতো জবরদস্ত সামরিক চুক্তির ঐতিহ্য এখনও এদেশ থেকে ফিকে হয়ে যায়নি। গত নভেম্বরের শেষে পরপর দুটি বিচক্ষণ চুক্তি ক'রে আবার নতুন ক'রে সেই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা হ'ল। প্রথম চুক্তিটি সই হ'ল ২৯ নভেমবর নতুন দিল্লিতে, চিনের সাথে। এটি অবশ্য অনাক্রমণ চুক্তি। কিন্তু অনাক্রমণ চুক্তি তো আদতে সামরিক চুক্তিই। আর কী আশ্চর্য, চিনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার এই চুক্তির ঠিক পরের দিনই বরফঘেরা সাইবেরিয়ার ইরকটুস্ক শহরে বসে ভারতীয় 'প্রতিরক্ষা' দফতরের কর্তাব্যক্তিরা সই করলেন ১৮০০ কোটি ডলারের আর এক মহার্ঘ চুক্তি। এই চুক্তি মোতাবেক ভারত রাশিয়া থেকে ৪০টি (২ স্কোয়াড্রন) জঙ্গি জেট বিমান কিনতে চলেছে। এটা ভারতের পক্ষে এযাবৎ কালের মধ্যে একক বৃহত্তম সামরিক চুক্তি।

এইসব সামরিক এবং বাণিজ্যিক লেনদেনগুলি অন্তঃরাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রেরণা হলেও, সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে এসবের সম্পর্ক সামান্যই। বিশেষ ক'রে প্রতিবেশী দেশগুলোর ভেতর অনেক সময় এমন সব সমস্যা থাকে, যা নিছক রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাদের গভীরতা ছুঁয়ে যায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতার দিগ্বলয়কেও। ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে সেরকমই এক সমস্যা ছিল গঙ্গা নদীর জলবণ্টন। এমন একটি অসামরিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা এবং তা নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে পৌঁছানোকে যথেষ্ট ব্যতিক্রমী ঘটনাই বলা চলে। কিন্তু ব্যতিক্রমই তো ইতিহাস গড়ে। ১২ ডিসেমবর গঙ্গাজল নিয়ে দুই দেশের দুই নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে-চুক্তি সাক্ষরিত হ'ল, তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক।

এমন একটি জটিল এবং স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এরকম একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যে দুই দেশের সমস্ত মহলকে খুশি করতে পারবে না, তা স্বাভাবিক। বাংলাদেশের কয়েকটি মহল যেমন বলছেন, শেখ হাসিনা ভারতের কাছে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিম বাংলাতেও অনুরূপভাবে কেউ কেউ এ-চুক্তিকে বাংলাদেশ-তোষণকারী বলেছেন। কলকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ নিয়ে হাহাকার ঘনিয়ে তুলেছেন কেউ। তবু যা হোক, আকস্মিক পশ্চিমবঙ্গ-প্রেমের কিছু নমুনা বহুদিন পর পেশ হ'ল। তবে এইসব মহলের বাংলাপ্রীতির পুরনো খতিয়ান অবশ্য খুব একটা সাফ নয়।

বাংলাপ্রীতির আর একটা নমুনা প্রকাশ পাচ্ছে গোর্খাল্যান্ডের দাবির বিরোধিতা ক'রে। 'বাংলা ভাগ হ'তে দেব না' - এমন একটি গরম ঘোষণায় পশ্চিমবাংলার উত্তরের পাহাড়ি এলাকার ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক-জনগোষ্ঠিগত-ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অথচ আবহমান বাংলার ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক-জনগোষ্ঠিগত-ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য পড়ে রয়েছে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে!

জানুয়ারি ১৯৯৭

১০.

এক বইমেলার সমাপ্তিঘণ্টার সাথে যখন করতালি দিয়ে ওঠে লক্ষ লক্ষ হৃদয়, তখন থেকেই তো শুরু হয়ে যায় আমাদের পরবর্তী বইমেলার স্বপ্ন দেখা। আবার কবে সেই মাঘরাত্রির শিশিরের মধ্যে মিশে যাবে ময়দানের ধুলো। সারসার স্টল-ছাতা-টেবিলে বিছানো থাকবে হাজার মানুষের হরফবন্দি হাজার মন। কোথাও গিটার হাতে গলা মেলাবেন গানপাগল ছেলেমেয়ের দল। কোথাও চিৎকার ক'রে কবিতা পড়বেন তরুণেরা। মাঠের ধুলোয় গ্যাঁট হয়ে বসে একের পর এক পোট্রেট এঁকে দেবেন আঁকিয়েরা। রঙিন শিশুরা বায়না করবেন আরও রঙিন সব বইএর জন্য। কোচবিহার থেকে পুরুলিয়া এমন কি ঢাকা চট্টগ্রাম থেকেও ছুটে আসবেন লেখক বন্ধুরা। হাতে হাতে ঘুরবে নতুন প্রকাশিত গল্প কবিতার বই, নাম-না-জানা কত না ছোটকাগজ। ছোট, কিন্তু অমোঘ।

সারা বছর ধরে তিল তিল ক'রে গড়ে তোলা আমাদের এই স্বপ্ন আজ ছাই হয়ে গেল চোখের পলকে। হিংস্র আগুনের হল্লা এসে বিনা যুদ্ধে গিলে নিল আমাদের জাতীয় উৎসব। বইমেলা ছাড়া আর কোথায়ই বা রয়েছে এমন হাজার প্রাণের মেলা! কত মানুষের বুকফাটা চিৎকার আর চোখের জল এসে মিশে গেল পোড়া-আধপোড়া বইয়ের স্তূপে। ছোট-মাঝারি প্রকাশক-বইবেচিয়েরা, যাঁদের অধিকাংশেরই সামান্য বীমা পর্যন্ত করানো নেই, এই কালোধোঁয়ায় ঢাকা দম-আটকানো অন্ধকার যে কতদিনে টপকাতে পারবেন, কে জানে! তবু তাঁদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য, হারিয়ে যেতে যেতেও থেকে যাওয়া একটা কলেজ স্ট্রিট রয়েছে। কিন্তু ছোটকাগজকেন্দ্রিক প্রকাশনগুলো? তাদের তো কোনও কলেজ স্ট্রিটও নেই। বৃহত্তর পাঠকের সাথে যোগাযোগের জন্য বইমেলাই তাদের প্রথম ও শেষ আশ্রয়। মেলার চিকন চিকন টেবিল থেকেই বিক্রি হয়ে যায় কালীকৃষ্ণ গুহ - দেবদাস আচার্য - অরুণেশ ঘোষের কবিতাবই, সুবিমল মিশ্র - সৈকত রক্ষিত - কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের গল্প-উপন্যাস। এপিডিআর-উৎস মানুষ-নাগরিক মঞ্চ'র মতো তৃতীয় চিন্তার প্রকাশনাগুলোকে তো মেলাতেই খুঁজে পান কলকাতার বাইরে

ছড়িয়ে থাকা উৎসুক মানুষ। তাই, বড় বড় বইব্যবসায়ীদের ক্ষতি যেমন আর্থিক, ছোটকাগজ ছোটটেবিলের ক্ষতি তেমন আত্মিক। এই দু'ধরনের ক্ষতি মিলে বইমেলার ছাই আজ কলকাতাকে পূর্ণগ্রাসে ঢেকেছে।

বইমেলা কর্তৃপক্ষ এবার তথাকথিত বিশ্বায়নের দিকে ঝুঁকেছিলেন। যে-বিশ্বায়নের চাপে পড়ে কলকাতার রাস্তা থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হকার উচ্ছেদ হয়, সেই একই ছকে বইমেলায় এবার হাজির হচ্ছিল নানান নতুন ফতোয়া। গান গাওয়া চলবে না। আড্ডা চলবে না। পথের ধারে বসে ছবি আঁকা চলবে না। ছোট প্রকাশনগুলির স্টলের নামও বাংলায় লেখা চলবে না (ভাবুন, ইংরেজি হরফে লেখা 'ছোটদের কচি পাতা')! আজকের গ্রন্থগ্রাসী আগুন, মেলাকর্তৃপক্ষের এই ভীমরতির মুখে এক জোরালো থাপ্পড়। ছোট আগুনকে ছোট অবস্থায় নিবিয়ে ফেলার মতো প্রাথমিক পরিকাঠামোই যেখানে তৈরি নেই, সেখানে তড়িঘড়ি আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার এই এলোপাথারি চেষ্টা, বিলিতি সাহেবদের হাতেও পাশনম্বর পাবে কি না সন্দেহ!

কিন্তু সাহেবদের সার্টিফিকেটের জোরে বইমেলা লক্ষ লক্ষ বইপাগল মানুষের মনের মেলা হয়ে ওঠেনি। বাংলার নিজস্ব প্রাণের জোরেই তা এমন একটা ব্যাপক উৎসবের স্তরে উঠে এসেছে। বইমেলা সত্যিই আমাদের সবার গর্বের আনন্দের প্রেরণার জায়গা। তাকে তাই বাঁচাতেই হবে। তার আলগা জৌলুসে যদি কিছু টান পড়ে, তাতেও ক্ষতি নেই। মেলায় বরং ফিরে আসুক তার পুরোন ছন্দ। যেখানে পেশাদারি দক্ষতা থাকবে, আন্তর্জাতিক মান থাকবে, কিন্তু তা উঠে আসবে বাংলার নিজস্ব ভাবসম্পদ থেকে। বইএর হাটের বিকিকিনির পাশাপাশি যেখানে ভাবের হাটেও টান পড়বে না। আগুনকে নির্বাসিত করা হবে, কিন্তু প্রাণের আগুনের ওপর কোনও ফতোয়া জারি হবে না।

আজকের নিষ্ঠুর আগুনের কাছে অন্তত এটুকু শিক্ষা যেন আমরা নিতে পারি। ভস্মের স্তূপ উড়িয়ে আবার যে বইমেলা চালু হচ্ছে, সেখানেই হোক আমাদের সেই পুনর্জন্মের স্বপ্ন দেখা।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

হায় রে ইন্ডিয়ার কবি!

ব্রাত্য রাইসু : পশ্চিম বাংলার এই যে ঢাউস বুদ্ধিজীবী শঙ্খ ঘোষ ওনারে তো কোনোদিন দেখলাম না এইসব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কথা বলতে। তো উনি যদি আইসা বলেন ঈদ মোবারক, আমি তো জিগাইবই সীমান্তে যে আপনেরা মানুষ মারতেছেন তার কী করা? উনি চুপ থাকবেন কী কারণে? ওনার রাষ্ট্র কি কথা কইলে ওনারে মাইরা ফেলাইবে।
04 October at 01:49
দোলনচাঁপা চক্রবর্তী : Raisu, Shankho Ghosh - jotodur jaani Godhra hotyakanDer pore strong statement diyechhilen. Aami to seta rekhe dii ni. JogaR korte cheshTa korchhi - jodi paari, paThabo.
07 October at 00:33
আমি : @দোলনচাঁপা, আপনি হঠাৎ শঙ্খ ঘোষের জন্য উতলা হলেন কেন? তিনি কে? তিনি কি আপনার-আমার প্রতিনিধি? আমরা কী ভাবছি-করছি সেটুকুই আমাদের বলার হক। শঙ্খ ঘোষের কোনও কথিত সুকৃতিতে যেমন আমাদের সাত খুন মাফ হয় না, তেমনই তাঁর কোনও কথিত নিষ্ক্রিয়তায় আমাদের মাথা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ার কিছু নেই। এ-বিষয়ে পরে বিস্তৃত কথা হ'তে পারে। আশা করি ভুল বুঝবেন না আমায়, অগ্রজ কবির প্রতি কোনও অহেতুক উষ্মাবশত কথাগুলো বলিনি কিন্তু!
09 October at 23:23

শঙ্খ ঘোষ কে? বদনবইএর (ফেসবুক) পাতায় এমন একটা প্রশ্ন করায় তাবৎ কবিতাপড়ুয়া বাঙালি আমাকে বে-আদব ভাবতে পারেন। পাঠকসমাজের একটি বিরাট অংশ শঙ্খ ঘোষকে উত্তর-জীবনানন্দ বাংলা কবিতার এক স্তম্ভস্বরূপ মনে করেন। তাঁর গদ্য, বিশেষত তাঁর রবীন্দ্রচর্চার নিদর্শনগুলি, তাঁকে মননশীলতার উত্তুঙ্গ আসনে স্থাপিত করেছে বলেও অনেকেই অনুভব করেন। একজন গড়পড়তা পাঠক হিসাবে আমিও সে-মহাভোজের সামান্য অংশীদার। কিন্তু কোনও নিরিখেই তাঁকে ভারতের সমাজবিবেকের কণ্ঠস্বর বলা যায় কি! পশ্চিমবঙ্গের পরিসরের বাইরে তাঁর, বা যেকোনও জীবিত বাঙ্গালি (প.ব-র) কবির কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা আছে? পরিবেশবাদী আন্দোলনের মতো কিছু সামান্য ব্যতিক্রমের বাইরে তেমন কোনও সর্বভারতীয় সুশীল সমাজের অস্তিত্বই তো ভারতের বহুজাতীয় পটে নিতান্ত আবছা। কর্ণাটক বা পাঞ্জাবের সুশীল সমাজ সম্পর্কে আমরা, পশ্চিমবঙ্গীয়রা, কতটুকু জানি, বা আমাদের ওপর তাঁদের কী বা নিয়ন্ত্রণ আছে! এমনকি যদি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের আঙিনাতেও চলে আসি, তাহলেও দেখা যাবে, একজন বিবেকী ব্যক্তিত্ব হিসাবে শঙ্খবাবুর গ্রহণযোগ্যতা প্রথমাবধি ছিল অনেকটাই বামপন্থী মহলে। গত তিন দশক জুড়ে প.ব-র অ'বাম' জনতার ভেতর, শঙ্খবাবু তাঁর কবিপরিচয় ছাপিয়ে সামাজিক অভিভাবক হিসাবে কতটা গ্রহণযোগ্য

ছিলেন, তা কিন্তু আমরা ভেবে দেখিনি। হালে আবার অঙ্কটা গুলিয়ে গেল, যখন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে শঙ্খবাবু সরকার-বিরোধী (বলা বাহুল্য, রাজ্যের) অবস্থান নিলেন। অতঃপর তিনি অ'বাম'দের চোখের মণি, এবং সরকারি 'বামেরা' তাঁর বিষয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ক'রে আছেন। কোনও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তাঁর এখনকার কোনও বয়ান, প.ব-র সীমানার মধ্যেও, কার কাছে যে কতদূর গ্রাহ্য হবে, তা টের পাওয়া মুশকিল।

ভারতের, পশ্চিমবাংলার, জনসমাজের এই জটিলতা আমাদের বাংলাদেশের বন্ধুরা টের পান না, বা তা টের পাওয়ার কথাও না। আমরাও যেমন শত শুভেচ্ছা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের সুশীলসমাজের নাড়ীর স্পন্দনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে, তার দৈনন্দিন টানাপোড়েনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে, পর্যাপ্ত ওয়াকিবহাল নই। শ্রদ্ধেয় কবি ফরহাদ মজহার তাঁর পারিবারিক নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে লুঙ্গি পরে ঢাকা ক্লাবে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলে (ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী চিদাম্বরম অবশ্য লুঙ্গি পরেই তাঁর কার্যভার সামলান!) তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সমাজ-রাজনৈতিক পটভূমিতে এই ঘটনা ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে কলকাতার খবরভোজী মানুষের আদৌ কোনও ধারণা আছে কি? ফলে দু'দিক থেকেই অনেক সরলীকরণের অবকাশ থেকে যায়। ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা যেমন মাঝে মাঝেই ধুয়া তোলে, পাকিস্তান-বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ, ভারত কেন হিন্দুদের দেশ (অর্থাৎ হিন্দুরাষ্ট্র) হবে না, তেমনই বাংলাদশের ইসলামি মৌলবাদীদের প্রচারেও ভারত একটি হিন্দুদের দেশ (অর্থাৎ হিন্দুরাষ্ট্র) মাত্র! বাংলাদেশের বহু মানুষ হয়তো এমনটাই বিশ্বাসও করেন। এটা একটা সরলীকরণ। আবার উলটো দিকে, ভারত(রাষ্ট্র)বিরোধী যেকোনও সমালোচনাই নিছক ইসলামি জঙ্গিদের প্রচারপরিকল্পনার অংশ - এই বিশ্বাসও সমান সরলীকরণ। পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের মানুষও যে সময় সময় অনুরূপ নানা প্রতিক্রিয়া দেখান, বা দেখান বৌদ্ধ শ্রীলঙ্কার মানুষ, সেদিকে সামান্য নজর রাখলেই, আমাদের সেই সরল ভুল ভেঙে যেতে পারে।

নোনা জলের মাছ যেমন পরিপার্শ্বের লবণের পরিমাপ বোঝে না, আমরাও যেন সেরকমই টের পাই না বা, বুঝতে চেষ্টা করি না যে, একটি বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে ভারত রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী বা আচরণমালা তার অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিবেশী দেশগুলির প্রতি কেমন? সেইসব দেশের সাধারণ মানুষের ভেতর ভারতের প্রতি কোনও ক্ষোভ আছে কি না? রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের এই 'বৃহৎ' অস্তিত্বের মোকাবিলা বাংলাদেশ-নেপাল-শ্রীলঙ্কা, সব দেশকেই নানাভাবে করতে হয়। ফলে তার একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ এসব দেশের মানুষের ওপর পড়াটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষজন, সুশীল সমাজ, এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন, তা আমরা খুব

কমই জানার সুযোগ পাই। কোনও বিশেষ প্রসঙ্গে তাঁদের ক্ষোভ বা আপত্তির গণতান্ত্রিক মর্মবস্তুগুলিকে শ্রদ্ধার সাথে পর্যালোচনা করার মানসিকতা যেন আমাদের থাকে।

বহুজাতিক ভারত রাষ্ট্রের সমাজ-রাজনৈতিক জটিলতাটি আবার বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্পষ্ট নয় বলেই, তাঁদের তরফেও অনেক ভুল বোঝবুঝির সৃষ্টি হয়। এইভাবেই হয়তো রাষ্ট্রিক প্রসঙ্গের ভেতর অযথা ধর্মীয় আবেগ চলে আসে। তাতে সমস্যার বহুকৌণিকতাটি আড়ালে চলে গিয়ে ফুটবল-মাঠের মতো বেশ একটা চৌকো চেহারা নেয় বটে, যার একদিকে 'আমরা' আর অন্যদিকে 'তোমরা', কিন্তু কোনও টাইব্রেকারেই সে-খেলার কোনও সমাধান কোনওদিন হয় না।

শঙ্খ ঘোষ কে? গুজরাট দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনি কী বিবৃতি দিয়েছিলেন, আজ এত বছর বাদে তা আমাদের তুলে ধরতে হবে? পশ্চিমবাংলার একজন সৃজনশীল মানুষও কি গুজরাট দাঙ্গাকে সমর্থন করেছিলেন? এসব কথা নতুন ক'রে উল্লেখ করাও লজ্জার। বরং বলতে পারা যায় ভারভারা রাওয়ের কথা, শঙ্খ বাবুরই মতো সম্মানিত এক তেলুগু কবি, নিছক রাষ্ট্রবিরোধিতার অভিযোগে বছরের পর বছর যিনি হাজতে পচেছেন। বলতে পারা যায়, মণিপুরের সেইসব বর্ষীয়াণ মহিলাদের কথা, যাঁরা বছর কয়েক আগে সেনাদফতরের সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ফৌজি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। তাঁরা কিন্তু হিন্দুই ছিলেন। হিন্দু পুষ্পকুমার ওরফে প্রচণ্ড নেপালের রাষ্ট্রপ্রধান হলে, তাঁকে গদি থেকে না-নামানো অবধি ভারতরাষ্ট্রের নিয়ামকরা ভালো ক'রে রাতে ঘুমাতে পারেননি। ওদিকে মুসলমান হামিদ কারজাই তাঁদের জিগরি দোস্ত। হিন্দু প্রভাকরণ যখন শ্রীলঙ্কার বাহিনীর হাতে নিহত হলেন, তখন সেই সেনা অভিযানকে কেউ আখ্যা দেয়নি - বৌদ্ধ আগ্রাসন। কী ক'রে দেবে? হিন্দু এলটিটিই-র হাতেই যে ভারতের তরুণতম এক প্রধানমন্ত্রীর নিধন।

হিঁদুয়ানি দিয়ে কি ভারত রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করা যায়! ভারত যে হিন্দুরাষ্ট্র নয় (হিন্দুত্ববাদীরা যতই চাক, কোনওদিন তা হবেও না), এটা তার একটা শক্তি। যে-শক্তির বলে সংখ্যা-লঘু-গুরু, কাউকেই রেয়াত না করলেও চলে। আধুনিকতা-বাদী সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সামনে আমাদের মতো চুনোপুঁটিরা কোন্ ছার, শঙ্খ ঘোষও নস্যি! বাংলা কবিতা ক'জন পড়ে ভারতে? বাংলাদেশের কবিতাপ্রেমীদের কাছে এই রহস্যটা ফাঁস হয় না বলেই, পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের দাওয়াত দিয়ে 'ইন্ডিয়ার কবি, ইন্ডিয়ার কবি' ব'লে খাতির করেন। হায় রে ইন্ডিয়ার কবি!

আশা করি, শঙ্খ ঘোষ কে? - এমন একটি বেমক্কা প্রশ্ন করার জন্য, অতঃপর আপনারা আমায় ক্ষমা করে দেবেন।

অকটোবর ২০০৯

ধনেশ পাখির হাড়

আলাপচারিতা একটি শিল্প বিশেষ। পরিবেশনের এলেমদারিতে অনেক বেগানা বিষয়ও যাঁহাদের জবানে খোশবু ছড়ায়, তাঁহাদের ঘিরিয়া ট্রেনে-বাসে-ট্রামে হরদমই মজলিশ বসিয়া যায়। ভাবগম্ভীর মানুষেরা এই সব সফেন বাক্যবাজিকে খোশগল্প বলিয়া লঘু করিতে চাহিলেও, হামেশাই ইহাদের ভিতর দিয়া সমাজ সংসারের অনেক হাঁড়ির খবর বাহির হইয়া আসে। হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়াও পড়ে ঢের। তবে এইসব কথকরা হইলেন নিরুদ্দেশের পথিক। বিশুদ্ধ আনন্দবিনিময়ই তাঁহাদের খায়েশ। আর যাহাই হউক, তাঁহারা জ্ঞান বিলি করিতে বা দল পাকাইতে চাহেন না। বাক্যবাজদিগের ভিতর আরেক প্রকার সম্ভ্রান্ত শ্রেণি রহিয়াছেন, যাঁহাদের বলা হয়, বাগ্মী। কথার খই ফুটাইয়া তাঁহারা ধূমধূলায় আসমান আঁধার করিয়া তুলিতে পারেন। অনেক সময় মানুষ ঘাড়ে করিয়া এইরূপ বচনবাগীশদের সভাসমিতি-আঞ্জুমানে বহিয়া লইয়া যায়, হাঁ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহাদের লেকচার শুনিবে বলিয়া। নবাবি আমল ফৌত করিয়া সায়েবি আমল পত্তন হওয়া ইস্তক, লেকচারই আমাদিগের লোকাচার। বক্তিমেতেই আমাদের ভক্তির পরাকাষ্ঠা।

এইরূপ বাক্‌পারঙ্গমদিগকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। একদল দল পাকাইবার জন্য, মাঠে-ঘাটে-বাটে গলার স্বর সপ্তমে চড়ান। আর একদল, ধোপদুরস্ত সভাকক্ষে গ্রাম্ভারি কায়দায় টীকাটিপ্পনি সহযোগে নির্ধারিত প্রসঙ্গের ভাষ্য হাজির করেন। মেঠো বক্তৃতাবাজদের সকলেই তেমন কিছু পণ্ডিত না হইলেও, মানুষের আঁতের কথা লইয়া গলা উঠাইয়া নামাইয়া হামেহাল মজলিশ জমাইয়া দিতে বিলক্ষণ জানেন। আর, সভাকক্ষের বক্তারা সচরাচর বিদ্বান। তাঁহাদের জ্ঞান ও বাগ্মিতার ধারা গঙ্গাযমুনার ভাবতরঙ্গের মতো মিশিয়া শ্রোতাদের সম্মোহিত করিয়া ফেলে। বলা বাহুল্য, এই সুশীল শ্রোতার ভিড়ে হুজুগে পাব্লিকও আকসার মিশিয়া রয়। আর, আমরা যাহারা বলিতে কহিতে পারি না, তাহারা ওই পাব্লিকসমাজ। চিরকাল শুনিতেই অভ্যস্ত। একটু আধটু হুজুগে না মাতিলে আমাদের চলিবে কেন? আমরা হুজুগ জমাই বলিয়াই রকম রকম বক্তৃতাবাজদের ঘিরিয়া সস্বচ্ছর এতসব ভিড়ের মোচ্ছব। এমন কি ময়দানে ডুগডুগি বাজাইয়া দুরারোগ্য বাতব্যাধি সারাইবার গ্যারান্টি দিয়া যাঁহারা ধনেশ পাখির হাড্ডি দিয়া বানানো তেলমালিশের ইন্তেজাম করেন, তাঁহাদের সামনে বৃত্ত রচনা করিয়া দাঁড়াইতেও আমারা কসুর করি না।

আমরা শুনিতে ভালোবাসি। কিন্তু শুনিয়া, কিছু বলিতে শিখি না। বলিতে শিখি না কেন? কারণ, আমরা বলিতে চাহি না। ভাবি, সকলেই বলিলে, শুনিবে কে! কাজেই যাঁহারা বক্তা, তাঁহারা বলিয়া চলেন। শুনিবার জন্য আমরা বৃত্ত রচিয়া

দাঁড়াই। বাহির হইতে ফিরিলেও, ঘাড়ে করিয়া বৃত্তটিকে ঘরের ভিতর লইয়া আসি। ব্যাপারটি এমন চুপিসাড়ে ঘটে, যে আমরা নিজেরাও উহা টেরটি পাই না। ঘরে বসিয়াও আমরা বোকা বাক্সের ভিতর দিয়া বা শয়নেস্বপনে বক্তৃতাই শুনিয়া যাই।

এখন এই তাবৎ বাক্যবাজির বিস্তার, যেন রাজপথে শকটপ্রবাহের একতরফা বন্দোবস্তের মতো। বক্তারাই প্রবক্তা। ট্রেনে-বাসে, মাঠে-ময়দানে বা ঠাণ্ডাঘরে, আলোচনার জন্য কোথায় কী বরাদ্দ, তাহা বক্তৃতাবাজরাই ঠিক করিয়া দেন। আমরা যাহারা বেঅকুফ শ্রোতা, তাহাদের কাজ স্রেফ হাততালি দেওয়া। বৃত্ত ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসার রেওয়াজ আমাদের ভিতর বড় একটা নাই। সে-পাঁয়তারা আমরা তখনই কবুল করি, যখন এক বৃত্ত ভাঙিয়া ঝটপট অন্য বৃত্তে সামিল হইবার হুজুগ উঠে। এই ভঙ্গবঙ্গের পশ্চিমখণ্ডে যেরূপ গত ২/৩ বছর ধরিয়া আমরা বাক্যবাজদের ঘিরিয়া থাকা বৃত্ত বদল করিয়াছি। কিন্তু কথার তুফান সমানে ছুটিতেছে। আমরা যথাপূর্ব বচনবাগীশদের কাজিয়াতেই মোহিত। বলিতে পারি না বলিয়া, কোনও নতুন সওয়ালও উঠাইতে পারি না। বক্তাদের পাঁঠা, তাঁহারা যেমন খুশি কাটেন।

কিছুদিন পূর্বের বৃত্তবদলের জোশে একটি শব্দ লইয়া খুব তুলকালাম হইতেছিল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। কে যে কোথা হইতে কীভাবে শব্দটি এস্তেমাল করিয়াছিলেন, কে জানে! দুম করিয়া বাজারে ছাড়িয়া দিলেন। অমনই, কবি হইতে কসাই, কেরানি হইতে কৃষক, সকলেই হল্লাগুল্লা জুড়িলেন - রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস! আমরাও ভ্যাবাগঙ্গারাম শ্রোতা, জানিতে চাহিলাম না, কাঁহা রাষ্ট্র কাঁহা সন্ত্রাস। আমাদের এই ভারত রাষ্ট্রে তথাকথিত যুক্তরাষ্ট্রীয়তার আর কোনও সুফল ফলুক আর না ফলুক, ইহার সুবাদে কমবেশি সকল রাজনৈতিক দলই এখানে রাষ্ট্র। কারণ সব দলই কোনও না কোনও রাজ্যে গদীয়ান। যেখানে যে-দলের রাজত্ব, তাহার বিরোধিতাই সেখানে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। অনুরূপভাবে, যেকোনও পুলিশি তৎপরতাই সেই সেই রাজ্যের বিরোধীদের কাছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং তাহা লইয়া আঞ্চলিক কূটকচাল ভারতে এইভাবে বেশ একটি খণ্ড খণ্ড চেহারা পাইয়াছে। তাহাতে রাষ্ট্রের সুবিধা দুই কিসিম। পহেলা, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা লইয়া বা ওড়িশায় কৃষক উচ্ছেদ করিয়া বহুজাতিক কারখানা পত্তন লইয়া ধুন্ধুমার বাধিলেও, কালিঘাটে কুমড়া বলি চালু হওয়া উচিত কিনা ইহা লইয়া সেমিনারে মত্ত থাকিতে কলিকাতার কোনও অসুবিধা নাই। বেশ এক প্রকার 'অন্যের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিবার' অলিখিত সনদে সকল আঞ্চলিক সত্তাই আপোশে দস্তখত করিয়া বসিয়া আছে। ঝামেলা এবং তাহার মোকাবেলা এইভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক পর্যায়ে সারিয়া লইতে পারিলে রাষ্ট্রের সুবিধা বই কি। তবে দোসরা সুবিধাটি আরও দূরপ্রসারী। জমিদারদের নিজ নিজ এলাকার লাঠিয়ালগিরি সেই সেই এলাকার মামলার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠায়, খোদ রাজার

হুকুমতটি দিব্য আড়ালে পড়িয়া যায়। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতা বনাম করুণানিধি, উ.প্রদেশে মায়াবতী বনাম মুলায়াম-রাহুল-রাজনাথ বা প.বাংলায় তৃণমূল বনাম সিপিএম কাজিয়ার আসমান ছোঁয়া ধূমধূলা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাতন্ত্র ও তাহার নখদন্তকে কুরুক্ষেত্র ময়দানের বৈকালী সূর্যের মতো ঢাকিয়া দেয়। নিশ্চিন্তে জয়দ্রথ হত্যার পর্বটি সমাধা হয়। কাশ্মীর বা মণিপুরের যুগ যুগ ব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কোনওভাবেই রাজ্য-ওয়ারি সন্ত্রাস-বিষয়ক পাড়াতুত বক্তৃতাবাজির বিষয় হয় না। আমরা, নিরালম্ব শ্রোতারাও, কোনওরকম প্রশ্ন তুলি না।

কথায় বলে, কচুগাছ কাটিতে কাটিতে মাসুম বালকও ডাকাতে পরিণত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের পরোয়া না করিয়া সহনাগরিকদের উপর খেয়ালখুশিমাফিক জুলুম করিতে করিতে, ভারতের উর্দিধারীরা রপ্তে রপ্তে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনকেও বুড়া আঙ্গুল দেখাইতে শিখিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বেসামরিক নারীপুরুষও তাঁহাদের সহজ চাঁদমারি বনিতেছেন। আর এইসব ঘটনা ঘটিতেছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেরই নাকের ডগায়। এইখানে ঘাঁটি গাড়িয়া থাকা বিএসএফ সান্ত্রীদের হাতে বাংলাদেশের একের পর এক মানুষ খুন বা জখম হইতেছেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতাকারী প.বঙ্গের সেইসব বাচিক শিল্পীরা কই? নাকি, এইসব ধারাবাহিক অমানবিকতার প্রতিবাদ, এবঙ্গের ঘরোয়া আকচাআকচিতে কোনওরকম ঝাঁঝালো ফোড়নপ্রয়োগের ভূমিকা পালন করিবে না বলিয়া, ইহা কোনও তরফেরই কোনও বক্তৃতার বিষয় হইবে না? গত বৎসর ফেলানি নামের একটি মেয়েকে মারিয়া তাহার লাশ তারকাঁটায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কলিকাতায় কোনও ট্যাঁ ফোঁ শুনা যায় নাই, কারণ আমরা 'পরিবর্তন' লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। এই বৎসর মাত্র কয়দিন আগে, বিএসএফ ছাউনিতে একজন বাংলাদেশী নাগরিককে ধরিয়া নগ্ন করিয়া অত্যাচার করা হইয়াছে। তাহার চলচ্ছবি নানান বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারও হইল। হায়, প.বঙ্গীয় বাক্যবাগীশরা নজরুল আকাদেমি বনাম ইন্দিরাভবন এবং আরও নানান মহা মহা বিতর্কে জেরবার। বিএসএফ-এর বর্বরতা লইয়া দু'কথা বলিবার সময় তাঁহাদের কই!

তাঁহারা বক্তা, আমরা আবহমান শ্রোতা। তাঁহারা যাহা বলিবেন, চোখ বড় বড় করিয়া আমরা তাহাই শুনিব। আর হাততালি দিব। কখনও কি বলিব না, ঢের হইল, এইবার কিছু নতুন কথা শুনিতে চাই, নহিলে এই লেকচারের লোকাচারে আমাদের কাজ নাই? বলিব না, ময়দানে ধনেশ পাখির হাড় বিক্রয় অনেক হইল, তাহা লইয়া হুজুগ জমাইতে আর আমরা রাজি নহি, নিজেদের বাতের ব্যথা আমরা নিজেরাই সারাইব?

পৌষ ১৪১৮

মনভ্রমরার সাঁটলিপি

গরুর রচনা ৬১
জুজুর ভয় ৬৫
তৎসম শব্দ – একটি বঙ্গীয় সফর ৬৮
মনভ্রমরার সাঁটলিপি ৭৭
অনন্তের অস্পষ্ট আভায় ৮৬
ভাষা লইয়া ভাসা ভাসা ৮৮

গরুর রচনা

সেই যে সেই বুদ্ধিমান ছাত্রটির গল্প আমরা সবাই জানি, যিনি পরীক্ষার খাতায় একটি ফুটবল খেলার বিবরণ লিখতে গিয়ে, গরুর রচনা লিখে ফেলে বিখ্যাত হয়ে গেছেন। হয়ত পোখরানের পরমাণু বা ওড়িশার মহাঘূর্ণি নিয়ে লিখতে হলেও, মরুভূমি-সমুদ্র পেরিয়ে এক দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি হেঁটে আসতেন তাঁর চিরচেনা শ্যামল গোচারণভূমিটির দিকে। আর পরীক্ষকের (পড়ুন, পাঠকের) চমৎকৃত চোখের সামনে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলতেন চতুষ্পদ, তৃণভোজী, গৃহপালিত সেই নির্বিরোধী পশুটির হাম্বারব।

কিন্তু বেছে বেছে গরুর রচনাটিই বা সেই কিংবদন্তী ছাত্রটির আয়ত্তে এল কীভাবে! বাঙালির গদ্যজীবনের সূত্রপাত এই শ্রুতিধর রচনাটি দিয়ে হয়ে ওঠে বলেই কি বীজমন্ত্রের মতো অন্তত এই একটি রচনা আমাদের সবারই রক্তে মিশে আছে, এমন ধারণা করা যায়? হয়তো। কাজেই আমরাও মনে মনে একটু সাহস অর্জন করি। সিয়াটেল, কারগিল বা কবিতামচ্ছব নিয়ে কথা বলার আমরা না-ই কেউ হতে পারি, তা বলে গরু নিয়েও কি দু'চার কথা ফাঁদতে পারি না? বিশেষত গো-শব্দের অর্থই যখন, যে যথেচ্ছ গমন করে।

যথেচ্ছ গমনই বটে! অর্থের লোভে শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে এক দরোজা থেকে আরেক দরোজায়। হাজার দুয়ার না হ'ক, অন্তত বিশ রকম অর্থের গোলকধাঁধায় আমাদের কলুর চোখবাঁধা বলদের মতোই ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় গো-শব্দটি। মনে হয়, সময় থেকে সময়ান্তরের সামাজিক প্রয়োজনের দাবি মেটাতে গিয়ে এত বিচিত্র অর্থের উৎপত্তি - গরু, পৃথিবী, বাক্য, ইন্দ্রিয়, চুল, তীর, একরকম যজ্ঞ, ষাঁড়, মা, স্বর্গ, দৃষ্টি, কিরণ, সূর্য, জনৈক ঋষি, পশু, গায়ত্রী, চোখ, দিক, জল, চাঁদ। মনে হচ্ছে, শুধু জন্ম আর মৃত্যুটাই বাদ পড়ে গেছে এই লম্বা ফর্দ থেকে। ভাষা কত সুবিধাবাদী হ'লে এমন সব বিপরীতমুখী অর্থ একটিমাত্র শব্দের ওপর আরোপ করা যায়! হালফিল ভাষায় মাল-শব্দটির কিছুটা এরকম শয়তানি বৈচিত্র্য রয়েছে। পণ্য বা মদ্যের পাশাপাশি, কথ্য শিল্প-সাহিত্য সমালোচনায় তো আমরা অবলীলায় বলি - 'মালটা ভালোই নামিয়েছে' বা 'যা মাল ছড়িয়েছে'!

শব্দের যথেচ্ছ গমনকে সংবৃত ক'রে আর একবার ফিরে আসি আমাদের শান্তশিষ্ট বন্ধুটির কাছে। নানা বরণ গাভীরে ভাই, এক বরণ দুধ - ভাবুকের এই উপলব্ধি বাংলার আবহমান সহজিয়া হৃদয়ের উত্তরাধিকার। কিন্তু আর্যাবর্তের বর্ণশাসিত সমাজ কি তার নিকটতম অবলম্বনকে পংক্তিবিভাজিত না ক'রে পারে? গরু একদিকে গো-মাতা, ভগবতী। অন্যদিকে শুদ্রসমাজের সেবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীকরণের মতো তারও কপালে পড়ে নানান বৃত্তির ছাপ - নস্তিক = নাক

ফোঁড়া গরু, যুগ্য = বিদা বওয়া গরু, প্রাসঙ্গ = ঘানিটানা গরু, হালিক = হেলে গরু, ধুরীণ বা ধুরন্ধর = গাড়ি টানা গরু, একধুর = এক পিঠ বা এক ভার বহনযোগ্য গরু, সর্বধুরীণ = দুই পিঠা গরু। কখনও কখনও গুণগত বিভাজনও ঘটে। যেমন - বন্ধ্যা গরু = বশা, যাকে পিছনের পা দু'টি বেঁধে দোয়াতে হয় = অচণ্ডী, গর্ভঘাতিনী = বেহৎ, বৃষভাক্রান্তা ঋতুমতী = সন্ধিনী, সুখে দোহনযোগ্যা = সুব্রতা, নবপ্রসূতা = ধেনু। এছাড়া, গায়ের রঙ অনুযায়ী শবলী, শ্যামলী, ধবলী।

যত নামের নামাবলীই তাকে পরানো যাক, গরু কিন্তু থামেনি। সে ছুটছে। তার পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে আমরাও পৌঁছে যাই এক আশ্চর্য গোবলয়ে। যেখানে উঠতে গরু, বসতে গরু, ঘুমে স্বপ্নেও গরু। শিব্রামি ভাষায় বলা যায়, গরুতর কাণ্ড! সেখানে ১০০০ গরুকে একের ওপর আরেকটি দাঁড় করিয়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে স্বর্গের দূরত্ব মাপার কল্পনা। সেখানে গোস্তনের মতো দেখায় বলে আঙুরকে বলা হয়, গোস্তনী। শ্বেতদূর্বা হ'ল, গোলোমী, অর্থাৎ গরুর লোমের মতো সফেদ। হরিতাল (সেঁকো গন্ধক) দেখতে গরুর দাঁতের মতো, অতএব তা গোদন্ত। বিশেষ এক ধরনের সুগন্ধি হ'ল গোপিত্ত। আর গলায় পরার এক অলঙ্কার হ'ল গিয়ে গোপুচ্ছ। অবশ্য মুখপোড়া হনুমানকেও গোপুচ্ছ বলে। দেওয়ালের গায়ে গরুর চোখের মতো দেখতে ফোকর থেকে গবাক্ষ। বোড়া ইত্যাদি প্রকাণ্ড সাপের নামান্তর গোনাস, তাদের নাক নাকি গরুর নাকের মতো! মাথায় গরুর ক্ষুরের চিহ্ন আঁকা বলে গোক্ষুরো, গোখরো সাপ। গোক্ষুরো-র শেষ ও-কারটা বাদ দিয়ে, একধরনের কাঁটাগাছকে আবার বলে গোক্ষুর। গোকর্ণ যে কাকে না-বলে! গণ্ডুষ দেখতে অনেকটা গরুর কানের মতই বটে, তা বলে এক ধরনের হরিণ, সাপ, খচ্চর, এমনকি কাশীর শিবলিঙ্গ - সবারই অভিধা গোকর্ণ! গোমুখ শব্দও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বিচিত্র সব বিষয়ের ওপর - বাদ্যভাণ্ড (ট্রাম্পেট), জপমালা(তসবি)র ঝুলি, বাড়ি, সিঁধ, বিলেপন, কুমির, শিবানুচর, জনৈক যক্ষ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে ধরে গোভক্তির এমন দশদিগন্ত প্রকাশ দেখতে দেখতে মনে পড়ে, বাঙালির অবিশ্বাসী মন একদিন বলেছিল - অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। সেই লক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে চোখ এসে আটকে যায়, গোধন শব্দে। আর্যাবর্তে কৃষি তখন সদ্যপ্রসূত। পশুপালক সভ্যতার চূড়ান্ত তখনও তেমন উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করেনি যাতে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। গরুই তখন শ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্পদ। মনে হয় সেজন্যই গরু আর গো-জাত নানান শব্দ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত হয়েছে হাজারেরও বেশি বার। গরুর গরিমা তখন নান্দনিক বোধেও সংক্রমিত। ঋগ্বেদের এক কবি তো বৈদিক দেবতাদেরও 'গো-জাতঃ' বলে ছেড়েছেন। গরুর ক্ষুরের ধুলো ওড়ানো সেই পথ বেয়ে যেতে যেতে আমরা পেয়ে যাই কত না বহুমূখী শব্দ - গোকীল (লাঙল), গোগ্রাস, গোচর, গোদারণ(লাঙল), গোধর(পাহাড়), গোধূম(গম), গোধূলি, গোধ্র(পাহাড়), গোনর্দ(ময়ূর), গবেষণা, গবাদল(ঘাস), গোমেদ,

গোলোক(বৈকুণ্ঠ), গোশীর্ষ(চন্দন), গোষ্ঠ, গোষ্পদ, গোসঙ্খ্য(গাভী গণনাকারী), গোসঙ্গ(সকাল), গোস্বামী। পেয়ে যাই, গো-মণ্ডিত কত না ব্যক্তি ও স্থাননাম - গভস্তি(অগ্নিপত্নী স্বাহা), গোতম, গোদাবরী, গোনাথ, গোপতি, গোপা, গোপাল, গোপী, গোবিন্দ, গোমান/গোমতী, গোমন্ত, গোরক্ষপুর।

গরুই শ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্পদ বলে গোপ-শব্দের অর্থ দাঁড়ায় রাজা। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় গোষ্ঠী = একই গো-বিচরণক্ষেত্রের শরিক, গোত্র = গোয়াল, সগোত্র = এক গোয়ালে যাদের গরু থাকে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় গোলুণ্ঠণ বা গোগ্রহ (বিরাট রাজার গরুর পাল লুঠ হয়ে যাওয়ার কাহিনী স্মরণীয়)। যে যত গোশালা ভেঙে গরু সংগ্রহ করতে পারে, তার সম্মান তত। তাই ইন্দ্রের আর এক নাম গোত্রভিদ্। এমন কি স্বনামধন্য ঋষিরাও গোধন সংগ্রহে কম উৎসুক ছিলেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লিখিত জনক রাজার যজ্ঞানুষ্ঠানের কাহিনীতে তার চমৎকার নজির রয়েছে। শিঙের ওপর ১০টি ক'রে সোনার আঙটি বসানো ১০০০ গাভী হাজির ক'রে সমাগত কুরু-পাঞ্চালের ব্রাহ্মণদের জনক বললেন - আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তিনি এগুলি গ্রহণ করুন। সবাই চুপচাপ। যাজ্ঞবল্ক্য সহসা শিষ্য সোমস্রবাকে বললেন - যাও, এই ১০০০ গরু নিয়ে আমার আশ্রমের দিকে এগোও। অন্য ব্রাহ্মণরা তো রেগে আগুন। রাজপুরোহিত অশ্বলের প্রশ্নের জবাবে যাজ্ঞবল্ক্য কবুল করলেন - শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের চরণে শতকোটি প্রণাম, আমার স্রেফ গরুর প্রয়োজন ছিল!

এই গো-ময় বিশ্ববীক্ষার প্রবল প্রকাশ দেখি গীতার ধ্যানেও। সেখানে বলা হচ্ছে - উপনিষদ্গুলি হ'ল গাভী, গোপালনন্দন তার দোহনকারী, অর্জুন গোবৎস, সুধীজন ভোক্তা আর গীতা হ'ল দোহিত দুধ। এমন কি ন্যায়শাস্ত্রের চত্বরেও ঢুকে পড়েছে গরুর প্রসঙ্গ, যার অন্তত ৩টি উদাহরণ পাচ্ছি আমরা - গোবিষাণ ন্যায়, গোবলীবর্দ ন্যায় আর গোলাঙ্গুল ন্যায়। ১. দুরন্ত গরুর ক্ষেত্রে যেমন সুকৌশলে প্রথমে একটি শিং ধরে অন্য শিংটি পরে ধরা হয় - যুক্তিস্থাপনার ক্ষেত্রে তেমন কৌশলের অবতারণা করা হ'ল গোবিষাণ ন্যায় (বিষাণ = শিং)। ২.বলীবর্দ শব্দটি বৃষবোধক, তবু চটপট বোঝানো যাবে বলে তার আগে গো-শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার ঘটানো হয়। অনুরূপ যুক্তিবিন্যাসকে বলে গোবলীবর্দ ন্যায়। ৩. শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে একদা এক অন্ধ মানুষ একটি গরুর লেজ ধরে অচেনা পথ পেরিয়েছিল। যুক্তির এরকম বিচরণই হ'ল গোলাঙ্গুল ন্যায়।

গরুর এত প্রতিপত্তি সত্ত্বেও কিন্তু ভাষা থেকে গোসব বা গোমেধ(যজ্ঞ)-এর মতো প্রাচীনতর শব্দগুলি তাড়ানো যায়নি, যা অশ্বমেধের মতোই গোনিধনকারী যজ্ঞের স্মৃতি বহন করে। গবাশন(=গোমাংস ভক্ষক)-এর প্রতিশব্দ হিসাবে মুচি-চামারের অনুপ্রবেশ ঘটলেও, হাজার হাজার শব্দের ফাঁকফোকরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকেছে একটি মোক্ষম শব্দ - গোঘ্ন। গোঘ্ন শব্দের অর্থ

অতিথি, যার আগমনে গোহত্যার প্রয়োজন ঘটত। আর্যাবর্তবাসীর পূর্বপুরুষরাও যে আদতে গরুখোর ছিল, তা এইভাবে ধরা পড়ে যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তো গর্ভবতী রমণীদের সুসন্তান লাভের জন্য ষাঁড়ের মাংস খাওয়ারও পরিষ্কার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, সেই সব সুসন্তানের কোনও কোনও উত্তরপুরুষের হাতেই একদিন গজিয়ে উঠল গোরক্ষিনী সভা। আর গোরক্ষার অজুহাতে সংগঠিত হতে থাকল একের পর এক বড় মাপের দাঙ্গা। অবস্থা একদা এমনই চরমে উঠেছিল যে বীতশ্রদ্ধ গান্ধী পর্যন্ত গরুর জীবনের জন্য মানুষের প্রাণনাশ করার বর্বর মূঢ়তাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে কলম ধরেন (*ইয়ং ইন্ডিয়া*, ২৯ মে ১৯২৪)।

বাংলা অতি ফাজিল ভাষা। দেবদ্বিজে, কোরানে-পুরাণে ভক্তি তার খুবই কম। গো-মাতা তো কোন্ ছার! বরং অদ্ভুত এক রাসায়নিক শক্তিতে সংস্কৃত-ফারসির উদ্বন্ধনে সে জন্ম দিয়েছে গোবেচারা-র। অন্যান্য তস্করের চেয়ে গরুচোরের মর্যাদা তার কাছে কিছু কম। গরু মেরে জুতো দানে সে পিছপাও নয়। গোয়ালিনীর প্রেম নিয়ে সে অনেক কাব্য ফেঁদেছে বটে, তবে গরুর বিচক্ষণতার প্রতিরূপে সে তৈরি করেছে গবুচন্দ্র বা গবারাম-এর মতো চরিত্র। হাতুড়ে বৈদ্যের নাম সে দিয়েছে গোবৈদ্য। পঞ্চগব্যের ক্ষীর-দই-ঘি তার সুখাদ্যের ফর্দেই রয়েছে, গোমুত্র তার কাজে লাগেনি, গোময়কে সে বানিয়েছে গোবর। আর সেই গোবর থেকে তৈরি হয়েছে এক কৌতুকপ্রতিমা - গোবর গণেশ। অপছন্দ পরিবারে সুন্দর মুখ দেখলে সে অনিবার্য ফুট কেটেছে - গোবরে পদ্মফুল। প্রতিবেশীর মাথায় প্রায়ই আবিষ্কার করেছে ষাঁড়ের গোবর পোরা। আর সর্বোপরি তার গল্পের গরুকে সে হরদম চালান করেছে গাছের মগডালে।

এখন আমাদের গল্পের গরুটিকে গাছ থেকে নামিয়ে এনে, আবার সেই ছাত্রবন্ধুর আদি পরীক্ষার খাতায় ফিরিয়ে দেবার সময় হ'ল। সেই প্রক্রিয়ায় একটি উপসংহার থাকা বিধিসম্মত। সেটি এইভাবে লিখিত হোক - গরুর রচনা = গরু বিষয়ক রচনা অথবা গরু কর্তৃক রচনা। পাঠকেরা দ্বিতীয় অর্থও স্বচ্ছন্দে ধার্য করতে পারেন। আমাদের সবার হয়ে আজ যাকে আমরা মাঠে নামিয়েছি, সেই গৌতম তো বাচ্যার্থে গরুর-ই তর-তম। চুপিচুপি বলে রাখি, মাস্টারমশাইরা ছোটবেলায় তাকে স্নেহভরে ঐ নামেই ডাকতেন। এখনও গ্রামের মাতব্বর এবং কর্তাব্যক্তিরা ঐ নামেই তাকে তাঁদের নিজ নিজ গোষ্ঠে তৃণভোজনে ডাকেন এবং অবাধ্যতায় বিচলিত হয়ে বলেন - দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভালো। তাদের গোশালা অবশ্য শূন্য থাকে না। তরুণ এবং নাতিতরুণ হাম্বারবে ধনধান্যপুষ্পে ভ'রে ওঠে। জয় হোক তাঁদের।

জানুয়ারি ২০০০

জুজুর ভয়

নমস্কার আজ্ঞে। আস সালাম ওয়ালিকুম। কোনও খবর না দিয়েই চলে এলাম আজ। কী, চিনতে পারছেন না তো! হলফ ক'রে বলতে পারি, আমি কিন্তু আপনার ভীষণ ভীষণ চেনা। জল-ঝলমল কচুপাতার ওপর দিয়ে ফড়িংয়ের মতো লাফাতে লাফাতে একবার পৌঁছে যান সেই টলমলে ছোট্টবেলায়। অবুঝ বায়নায় বাড়ি মাথায় করছেন। মা ব্যর্থ। বাবা নাকাল। দিদুন এসে কোলে নিয়ে বারান্দার ঝাপসা অন্ধকারে কী যেন একটা দেখিয়ে বললেন - ঐ যে, জুজু! ব্যাস্, আপনি ঠান্ডা। সেদিনের সেই হাওয়া-হাওয়া বুঝতে-না-পারা জুজু কোথায় যেন হারিয়ে গেছে আপনার ছেলেমেয়েবেলার সঙ্গে। কিন্তু নানা নামে, নানা চেহারায়, সে কি বারবার ফিরে ফিরে আসেনি, আপনার নানান বয়সের নানান চোরাগলিতে? অপরাধ নেবেন না, আমিই সেই চেহারাহীন চরিত্র, আপনার মতো শিশুকে ভয় দেখাবার জন্য আপনার অভিভাবকেরা যাকে সৃজন করেছেন যুগে যুগে। নাঃ, এবার কিন্তু ভয় দেখাতে নয়, স্রেফ সামান্য একটু আলাপচারিতার লোভে চলে এলাম আপনার নিরিবিলিতে, না-ডাকতেই। ভয় পাবেনই বা কেন? জুজু বলতেই যে জুজুৎসুর প্যাঁচে ধরাশায়ী হতে হবে - এমনটা ভাববেন না মোটেই। ওসব জাপানি প্যাঁচ-পয়জারের সঙ্গে সত্যিই তো আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এমন কি দুর্যোধনের যে এক ভাই ছিলেন যুযুৎসু, তাঁর সাথেও না। দুর্যোধনের ভাই হলেও, তাঁর মা কিন্তু কান্দাহার(গান্ধার)কন্যা গান্ধারী নন। যুযুৎসুর মা ছিলেন এক বৈশ্যকন্যা - কে জানে, আজকালকার কোনও মিৎসুবিসিরই প্রত্ন-পিসি কি না! তবে, জাপানি-আফগানি, যে-ঘরানারই হোক, নির্ঘাৎ লড়াকু ছিলেন সেই যুযুৎসু। সেই জঙ্গি মেজাজের সাথে তাল মিলিয়ে, সংস্কৃত মতে, তাঁর নামের একটা মানেও খাড়া করা যায়, যিনি যুদ্ধ করতে উৎসুক।

আমার কিন্তু যুদ্ধের উৎসাহ আদৌ নেই। ছিলও না কস্মিনকালে। মেদিনীকোষ নামের এক অভিধানে বেগ বা গতিবাচক জু-ধাতু নিষ্পন্ন জুঃ-শব্দের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে - আকাশ, সরস্বতী, পিশাচী এবং গতিশীল নারী। দ্রুতগতিতে ধাবমান কোনও মহিলা, তারপর সে যদি আবার হয় পিশাচ রমণী - ছেলেধরা না হয়েই যায় না (মেয়েধরা হতেই বা ক্ষতি কী)। সাক্ষাৎ জুজুবুড়ি! কিন্তু এই 'ভয়ঙ্কর' পিশাচ আসলে কারা? পিশিত বা মাংস ভক্ষণকারী এক প্রেতযোনি জাতিবিশেষ? তাহলে পৈশাচি প্রাকৃত কাদের ভাষা? গুণাঢ্য নামের এক লেখক নানান রূপকথা আর লৌকিক প্রণয়কাহিনি নিয়ে এই পৈশাচি প্রাকৃতেই রচনা করেছিলেন এক কথাসংগ্রহ বড্ডকহা(=বৃহৎ কথা)। এ-ভাষার মূলে ছিল উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত গান্ধারি উপভাষা। অমরকোষে অবশ্য

পিশাচদের দেবযোনি জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, বিদ্যাধর-অপ্সরা-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর-গুহ্যক ও সিদ্ধ জনের পাশাপাশি। দেখছেন, সবকটিই অনার্য জাতি! এখানে একটা লোভ আমি কিছুতেই সামলাতে পারছি না। বড় ঘর, বড় গাঞীয়ের সাথে আত্মীয়তা দর্শাবার লোভ কে-ই বা সামলাতে পারে বলুন। হোক না সে সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের অমুক তসুক। দেখুন, অমরকোষের সাক্ষ্য অনুযায়ী পিশাচের আত্মীয়জন হ'ল বিদ্যাধর (=জাদুকর)। বিদ্যাধর নামের উৎস কী? স্পষ্টতই বিদ্যা, অর্থাৎ সরস্বতী। আবার মেদিনীকোষও বলছে, জুঃ অর্থ সরস্বতী। অর্থাৎ কোনও না কোনওভাবে সরস্বতীর সাথে জুজুর একটা সম্পর্ক রয়েইছে। অন্তত দুষ্টু সরস্বতীর সাথে! কে না জানে, যেখানে বৃদ্ধার বেশে আর কাজ হয় না, সরস্বতীর সাজেই তখন ভালো ভালো ছেলেদের ঘাড় মটকানো যায়, মেয়েদেরও।

ফারসি ভাষায় দেখা যাচ্ছে, জু-শব্দের অর্থ, অন্বেষণকারী। বুদ্ধিমানদের কষ্টকল্পনায় সেই অনুসন্ধায়ীই হয়তো হয়ে উঠল এমন একটা চরিত্র - যে, দুষ্টু বাচ্চা খুঁজে বেড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকার ভাষাতেও জুজু বলে একটা শব্দ আছে। তার একটা অর্থ জাদু। অন্য অর্থে প্রসিদ্ধি তার অপদেবতার। অপদেবতাটি আবার এক ভূতের আশ্রিত। সেই ভূতের সাহায্য পাওয়ার আশায় তাই জুজুকেই পুজো করা হয়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার একটু ভয় ভয় করছে। জুজুর পিছু পিছু ধাওয়া করার নেশায় এক্কেবারে আফ্রিকা! নেশা ছাড়ানোর চিকিৎসায় একবার কিউবা যাওয়াটাই যা বাকি রইল। ঠাট্টা থাক। একটা কথা সাফ সাফ বলি। জুজুবুড়ি বানিয়ে আমার ওপর এই যে মহিলাত্ব আরোপ, এ আমার বিলকুল না-পসন্দ। মনে হয় এটা সেন-আমলে আমদানি করা পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদের কারসাজি। নারীবিরোধী নিম্নবর্গবিরোধী সে-আবহের ধারাবাহিকতাতেই বুঝি একে একে সৃষ্টি হয়েছে ডাকিনী, যোগিনী, অলক্ষী, দুষ্টু সরস্বতী, উঁচকপালি, চ্যাংমুড়ি, ভাতারখাকি, বেবুশ্যে আরও কত অবমূল্যায়িত ছায়ামুখ।

শুনেছি ভীতুরাই নাকি ভয় দেখাতে ভালোবাসে। কিন্তু এই যে এতবার আমার নামে-বেনামে আপনাকে জীবনভর ভয় দেখানো হ'ল, এর শুরুটা কোথা থেকে? মনে হয় রেওয়াজটা আমাদের বাংলাদেশেরই নিজস্ব উদ্ভাবন। সংস্কৃত বা ফারসি থেকে পরবর্তীকালে আর্থিক সমর্থন মিললেও, জুজু নামটার মধ্যে অনুকার ধ্বনির এমন ব্যবহার, কেমন যেন বাংলা বাংলা মনে হয়। এই ধরনের অন্য শব্দগুলো দেখুন - ঘুঘু, ছুছু, (হা)ডুডু, ঢুঢু, থুথু, নুনু, হুহু - এসবই তো ১৬ আনা দিশি বাংলা শব্দ। এই বাংলা শেকড়ের তালাশ পাচ্ছি বৌদ্ধ জাতকের গল্পেও। বুদ্ধের আগের যুগে, বাংলায় তখন কৌম সমাজ। আজকের বর্ধমান বিভাগে সেকালে শিবি নামে এক রাজ্য ছিল। তার রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগর, যা হালের মঙ্গলকোট। শিবিরাজ বেস্সান্তরের একমাত্র উৎসাহ জনহিতে সমস্ত বৈভব বিসর্জনে। তা, সবকিছু এভাবে দানছত্র করে দিলে রাজ্য চলে কীভাবে? দুশ্চিন্তায়

রাজ্যের মোড়লদের চোখে ঘুম নেই। একদিন আর সইতে না পেরে উগ্‌গ (=উগ্রক্ষত্রিয়?) আর বৈশ্যরা জোট বেঁধে রাতারাতি তাঁকে বঙ্কগিরিতে অর্থাৎ শুশুনিয়া পাহাড়ে নির্বাসনে পাঠাল। বঙ্কগিরি হয়তো বাঁকুড়ারই সংস্কৃতায়িত রূপ, যেমন কব-দাক্ হয়েছে কপোতাক্ষ, দাম-দাক্ হয়েছে দামোদর! যাক সে কথা। বেস্‌সান্তর আর এই নির্বাসিত দশায় কী করেন। সেই পাহাড়ের কোলেই তৈরি করলেন এক নিরিবিলি আশ্রম। একদিন নিজের সন্তানদেরও বিলিয়ে দিয়ে সাঙ্গ করলেন দানপারমিতা। তারপর ব্রতী হলেন শিবিধর্ম প্রচারে। বুদ্ধের সমকালে বঙ্কগিরির সেই আশ্রমের আচার্য ছিলেন অরাধমুনি। সংসারত্যাগের পর বুদ্ধ এই অরাধমুনির শিষ্যত্ব নেন ও টানা পাঁচ বছর শিবিধর্ম চর্চা করেন। পরবর্তীকালে প্রচারিত বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনে শিবিধর্মের গভীর প্রভাব রয়েছে। তাঁর শিষ্যরা মনে করতেন বুদ্ধ নিজেই পূর্বজন্মে বেস্‌সান্তর রূপে জন্মেছিলেন। সেই বেস্‌সান্তর-জাতকের কাহিনি থেকে জানা যাচ্ছে - নির্বাসিত শিবিরাজ একদিন বঙ্কগিরির এক পাথরখণ্ডের ওপর বসে একমনে ভাবছেন, কীভাবে পূর্ণ করা যায় দানপারমিতা। এমন সময় জুজক নামে এক কুৎসিত, নিষ্ঠুর বৃদ্ধ সেখানে হাজির। তরুণী স্ত্রীর প্ররোচনায় সে এসেছে বাড়ির কাজে সাহায্য করার জন্য দাস-দাসী সংগ্রহে। তার এই প্রার্থনায় বিগলিত হ'ল বেস্‌সান্তরের হৃদয়। পুত্র জালীকুমার আর কন্যা কৃষ্ণাজিনাকে দান ক'রে দিলেন তিনি। জুজক তাদের লতা দিয়ে বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে মারতে মারতে নিয়ে চলে গেল দূরের বনপথে। সেই থেকেই বাংলার আবহমান মায়েরা আপনার মতো দুষ্টু ছেলে/মেয়েকে জুজুর ভয় দেখিয়ে আসছেন।

জুজুকে নিয়ে আমার গপ্পোগাছা কূটকচালি এ-যাত্রা সব খতম। পাততাড়ি গুটনোর আগে একটা গোপন কথা এই তালে ফাঁস ক'রে দিই। আসলে তো জুজু বলে কিচ্ছুটি নেই, স্রেফ একটা কল্পিত জীব। বেচারার নাম ক'রে ভয় দেখানো হয় মাত্র। তাই দেখবেন, ভয়টা ঠিক জুজুকে নয়, জুজুর মতো কাউকে। যেমন টিনা তার হেডদিদিমণিকে, দিদিমণি তাঁর কর্তা থানার দুঁদে বড়বাবুকে, বড়বাবু এসপি সাহেবকে, এসপি সাহেব তাঁর বুদ্ধিজীবী গিন্নিকে, এসপি-গিন্নি তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক এক সচিবকে (কলেজ লাইফের কয়েকটা বেসামাল ছবি রেখে দিয়েছে, কী যে চায় হারামিটা!), সচিবমশাই মন্ত্রীর প্রিয়পাত্র মাস্তান কবিকে, মাস্তান কবি আরশোলাকে জুজুর মতো ভয় পান। এসব অবশ্য কোনও গোপন কথা নয়। গোপন কথাটা কী জানেন? হাজার বছর ধরে এত যে ছেলেমেয়ে দেখলাম - সব্বাই প্রায় একরকম। জুজুর ভয়ে সব্বাই কাত। কিন্তু দুটোচারটে বেআদবের নমুনা সব যুগে দেখে এলাম - যাদের প্রাণে কোনও ভয়ডর নেই গা! এখন আপনিই ভাবুন, আপনি কোন দলে।

জানুয়ারি ২০০০

তৎসম শব্দ – একটি বঙ্গীয় সফর

মানুষের সামাজিকতার সবচেয়ে বড় নজির হচ্ছে তার ভাষা। সবার কাছ থেকে পালিয়ে মানুষ যখন স্রেফ নিজের সাথে কথা বলতে চায়, ভাবতে চায় নিজের মতো ক'রে, তখনও কিন্তু তার আশ্রয় সেই সামাজিক ভাষাটাই। এক-একটা ভাষার ইতিহাসের ভেতর তাই লুকিয়ে থাকে এক-একটা সমাজের ইতিহাস, এক-একটা জাতির ইতিহাস।

মানুষ যেমন মানুষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে পারে না, ভাষাগুলোও তেমনই। এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির মোলাকাত হয় – কখনও লড়াইয়ের মাঠে, কখনও বাজারে বন্দরে, কখনও একলা অভিযাত্রীর দুঃসাহসে, কখনও বা নিছক জ্ঞানচর্চার পিপাসায়। অমনই ভাষাগুলোর ভেতর শুরু হয় কানাকানি, ফিসফাস। কেউ দানে ধন্য হয়, কেউ গ্রহণে।

এইভাবেই একদিন ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রিক প্রভাবের ফলে সংস্কৃতে গোটা ত্রিশেক গ্রিক শব্দ ঢুকে পড়েছিল। গ্রিকেও গিয়েছিল অল্প কিছু সংস্কৃত বা দু'চারটি মিশরি শব্দ। বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে চিনা ভাষায় গোটা দশেক ভারতীয় শব্দ এসে যায়। আরবিতেও দু'চারটি ভারতীয়, কিছু গ্রিক, হিব্রু বা সিরিয় শব্দ দেখা যায়। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে যেমন সংস্কৃত শব্দ ঢুকেছে যদৃচ্ছ, সংস্কৃতকেও হজম করতে হয়েছিল প্রায় সাড়ে চারশ দ্রাবিড় শব্দ।

অন্য ভাষা থেকে নেওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর ভাষাগুলোর চরিত্র দু'ধরনের। প্রথম দলটিকে বলা যায় সৃজনশীল। যেমন জর্মান, চিনা বা আরবি। এরা নতুন কোনও ধারণার মুখোমুখি হ'লে শব্দ যথাসাধ্য নিজেরাই বানিয়ে নেয়। আর দ্বিতীয় দলটি হ'ল পরাশ্রয়ী। এদের মধ্যে পড়ে জাপানি, ফারসি আর ইংরেজি। জাপানি ভাষার অবলম্বন হ'ল হাজার হাজার চিনা শব্দ। অবশ্য তারা এখন চেহারা পালটে দিব্যি জাপানি হয়ে গেছে। তেমনই ফারসিতে ৬০% থেকে ৮০% আরবি শব্দ। ইংরেজিতেও ৬০%-এর বেশি শব্দ লাতিন-মুলের, হয় সরাসরি লাতিন থেকে নাহয় ফরাসি মারফত নেওয়া। যেকোনও গহন গম্ভীর জটিল ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ইংরেজির এই অলজ্জিত অধমর্ণতা আখেরে দুনিয়ার পয়লা নম্বর ভাষা হতে তাকে সাহায্যই করেছে।

ভাষাগুলির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সবসময়ই যে এমন সোনালি ফসল ফলানো পলিমাটি ফেলে বন্যার স্মৃতির মতো চলে গেছে, তা অবশ্য নয়। কারণ ভাষার আশ্রয় তো সমাজ। একটি বিশেষ ভাষার আশ্রয় একটি বিশেষ জাতির বা জাতিসমূহের সমাজ। অনেক সময় কোনও সবল জাতি তাদের দুর্বল ভাষা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোনও দুর্বল জতির সবল ভাষার ওপর। ভাষায় ভাষায় টক্কর চলেছে বহুদিন। শেষে তৈরি হয়েছে ভাষার এক নতুন চেহারা, যার অন্বয়পদ্ধতি

হয়তো বিজিতের, শব্দভাণ্ডার বিজয়ীর, কিংবা উল্টোরকম কিছু। আবার কখনও বা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেছে বহু বিজিতের ভাষা। বিজয়ীর ভাষা মুখে নিয়ে তারা রচনা করেছে তাদের পরবর্তী ইতিহাস - আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায়। আজকের আর্যাবর্তেও তো অনেক ভাষা মরণোন্মুখ বা মৃতই!

পূর্ব উঃপ্রদেশের কয়েকটি জেলা আর বিহারের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মানুষের কথ্য ভাষা ভোজপুরিকে কি বাঁচাতে পারল কবীরের কালোত্তীর্ণ দোঁহাগুলি? পাঞ্জাবি, ব্রজভাখা বা খড়িবোলির প্রভাব থাকলেও, কবীরের ভাষা ছিল মূলত ভোজপুরি। কোথায় গেল মগধ(পাটনা-গয়া) অঞ্চলের সুপ্রাচীন লোকভাষা মগহি? বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিলির আলো জ্বলছে টিমটিম ক'রে। তুলসিদাস কিন্তু রামচরিতমানস লিখেও বাঁচাতে পারলেন না আওধিকে। আশ্চর্য, এই আওধিতে রচিত মালক মুহম্মদ জ্যয়সির পদুমাবত (খ্রি.১৫৪০) অবলম্বনেই আলাওল লিখেছিলেন প্রথম বাংলা ধর্মনিরপেক্ষ কাব্য পদ্মাবতী (খ্রি. ১৬৪৬)! বঘেলি আর ছত্তিশগড়ির কথা বাদই দিলাম। কিন্তু ব্রজভাখা, যার জনপ্রিয়তা এক সময়ে মথুরা অঞ্চল ছাড়িয়ে সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল? মীরাবাই, তুলসীদাস, কবীর, নানকের মতো প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাও এ-ভাষায় লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। হায়, সম্রাট আকবরের উৎসাহ-আনুকূল্য আর তাবড় কবিদের রচনাও হার মেনে গেল! সবই আজ তিমিঙ্গিলের পেটে। আত্মপরিচয়হীনতার অন্ধকারে কবে হারিয়ে গেছে কনৌজি, কুমায়ুনি আর গাঢ়বালি।

এইসব মৃত্যুর মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষাকে সত্যিই খুব সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়। কিন্তু স্রেফ কপালজোরে কি একটি ভাষা টিকে থাকতে পারে, এমন কি রবীন্দ্রনাথকে পেয়েও? যদি না দরদ থাকে নিজের ভাষার প্রতি, যদি না হুঁশ থাকে! ভাষার প্রতি সেই দায়বদ্ধতার সংরক্ত চেহারা বাঙালি দেখিয়েছে ঢাকায়-শিলচরে, প্রাণের মূল্যে।

২.

বাংলা আমাদের নিজেদের ভাষা বলেই তা একেবারে দোষত্রুটিহীন, এমন কথার কোনও মানে নেই। এখুনি হয়তো এর দশ রকম দুর্বলতার কথা ধরিয়ে দেবেন পণ্ডিতেরা। কিন্তু এ-ভাষার স্বভাবটা যে মোটের ওপর নমনীয়, তা নিয়ে বোধ হয় তর্ক নেই। শব্দ সংগ্রহের ব্যাপারে তা ইংরেজিরই মতো পরাশ্রয়ী, ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতবিচারের ধার ধারে না বড় একটা।

বাংলার শব্দসংসারকে তিনটে বড় ভাগে ভাগ করা যায় - বাংলা শব্দ (৫১%+), অনুস্বর-বিসর্গহীন সংস্কৃত বা তৎসম (৪৪%) আর অতিথি বা কৃতঋণ শব্দ (৪%+)। মুখের কথায় অবশ্য তৎসমের অনুপাত লক্ষণীয়ভাবে কম, মাত্র

১৭%। জায়গাটা নিয়ে নেয় অতিথি (১২%) আর বাংলা (৭১%) শব্দের দঙ্গল। বাংলা শব্দ বলতে এখানে প্রাকৃতজ সব শব্দ (অর্থাৎ ব্যাকরণে যাদের তদ্ভব আর অর্ধতৎসম বলে), আর অজ্ঞাতমূল যেসব শব্দ আমাদের আদিম ঐতিহ্য থেকে বয়ে আসা (অর্থাৎ কিনা 'দেশী') - সেই সব শব্দকেই বোঝানো হচ্ছে। অতিথি শব্দের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৩৫-৪০টি তুর্কি, ১১০টার মতো পর্তুগিজ, প্রায় আড়াই হাজার ফারসি (ফারসির মারফত পাওয়া আরবি সমেত), আর ক্রমেই বেড়ে চলা সহস্রাধিক ইংরেজি শব্দ।

ঐতিহাসিক বিকাশের স্বাভাবিক রাস্তা ধরে এগোলে, হালের লেখ্য বাংলাতেও তৎসম শব্দের পরিমাণ ঢের কমই রইত। হাজার বছর আগে ব্যবহার হওয়া বহু তদ্ভব আর দেশী শব্দ গায়েব হয়ে গেছে, এমন কি আমাদের মুখের ভাষা থেকেও। বস্তুত *চর্যাপদ*-এ (আনু. খ্রি.৯৫০) তৎসম শব্দের অস্তিত্ব ছিল মাত্র ৫%। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ (আনু. খ্রি. ১৪০০) তা বেড়ে হয় ১২.৫%। তৎসম শব্দের এই বিপুল অনুপস্থিতি থেকে মনে হয়, চর্যাপদগুলি হয়ত সিদ্ধাচার্যদের গহন হেঁয়ালি মাত্র ছিল না। প্রাচীনতর অবহট্ট-অপভ্রংশ পর্যায়ে যে-উদ্দেশ্যেই সেগুলি রচিত হোক, ব্রাহ্মণ্যবাদের বাইরে পড়ে থাকা বিপুলসংখ্যক 'অন্ত্যজ' মানুষ ক্রমেই বাংলা হয়ে আসা এই গানগুলির ভাষাকে আশ্রয় ক'রে ভুসুকুর মতো বাঙালি হ'য়ে উঠতে চেয়েছিলেন। আর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ তো কোনও ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। আমজনতার রসাস্বাদনের জন্য তার দরোজা দু'হাট ক'রে খোলা। কোনও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের কম্বল মুড়ি দিয়ে তার তাপ পোহাতে হয় না। ইতিহাসের এ এক অদ্ভুত মস্করা এই যে, তৎসম শব্দের বিপুল অনুপস্থিতির কারণেই এই রচনাগুলি আজ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য!

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (খ্রি.১৪৮৬-১৫৩৪) বাংলার সমাজমানসে এক কালান্তরের উড়াল এনেছিল, সন্দেহ নেই। সাহিত্যেও খুলে গিয়েছিল বিষয়বৈচিত্র্যের আজস্র ঝরোকা। গড়ে উঠেছিল এক পরিশীলিত রুচিবোধ। কিন্তু বর্ণহিন্দু লেখকদের হাতে পড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী জড় চাঙ্গা হতে বেশি সময় লাগেনি। বিষয়গত দিক থেকে যেমন, ভাষার ওপরও তেমনই তার এক উলটানো-পা প্রভাব পড়ল। শুরু হ'ল তদ্ভব শব্দের সংস্কৃতায়িত পরিমার্জনা। চিন্তাচেতনার উচ্চতর পর্যায়কে রূপায়িত করার জন্য কার্যকরী বাংলা শব্দ তৈরি করার বদলে, নতুন ক'রে তৎসম শব্দ আমদানিও শুরু হ'ল। বিশেষ ক'রে সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষম অনুবাদকদের হাতে এই কাণ্ডটা বেশি ক'রে ঘটল। কল্পনাহীন আক্ষরিক তর্জমায় ধার করা তৎসমের বহর এসে হাজির হ'ল। ফলে, ১৭শ শতক নাগাদ বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হয়ে দাঁড়াল এই নয়া-তৎসম শব্দগুলি।

অবশ্য প্রায় একই সময়ে একটা অন্য ধরনের ঢেউও এসে আছড়ে পড়েছিল বাঙালির ভাষায়। তুর্কি অভিযান (খ্রি.১২০৫) দিয়ে শুরু হওয়া তুর্কি,

তুর্ক-আফগান, মুঘল প্রমুখ শাসকদের ধারাবাহিক শাসনামলে, প্রথমে মুখের কথায়, পরে লেখার ভাষায়, ক্রমেই এসে হাজির হ'তে থাকল ফারসি আর ফারসির মারফত আরবি ও তুর্কি শব্দ। প্রাক্-তুর্ক *চর্যাপদ*-এ ঐতিহাসিক কারণেই এই মিশাল শুরু হয়নি। এমন কি তুর্কি অধিকারের দু'শতক পরে রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর ৯৫০০ পংক্তিতে ফারসি শব্দ মাত্র ১০/১২টি। কিন্তু তারপর থেকে এই সংখ্যা শুধু বেড়েই চলেছে। বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ*-এ (১৫শ শতকের শেষে) ১৮,০০০ পংক্তিতে ১২৫টি, মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল*-এ (১৬শ শতকের শেষে) ২০,০০০ পংক্তিতে ২০০-২১০টি, ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ (খ্রি ১৭৫২) ১৩,০০০ পংক্তিতে ৪০০+। রামপ্রসাদের (খ্রি. ১৭২৩-১৭৮১) এক অবিস্মরণীয় ৮ পংক্তির রচনা - মন রে কৃষিকাজ জান না... তে পাচ্ছি এই শব্দগুলি - জমিন, আবাদ, ফসল, তছরুপ, বাজাপ্ত, এক্তার। 'আধুনিক' বাঙালির মননশীল লেখা থেকে এই শব্দগুলি কীভাবে যেন তছরুপ হয়ে গেল!

সমসাময়িক বাংলা গদ্যের যেটুকু নমুনা চিঠিপত্র-দলিল-দস্তাবেজ থেকে পাওয়া যায়, তা আবার এতটাই আরবি-ফারসি বহুল, যে আজকের রুচি নিয়ে তাকে আমাদের আদর্শ বলতে বাধবে। কখনও কখনও প্রয়োগের ভারসাম্য অবশ্য এক অন্যরকম সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দিয়েছে। যেমন, পুত্র গুরুদাসকে লেখা মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি (খ্রি.১৭৭১)-

> অদ্য চারি রোজ এথা পৌঁছিয়াছি। ... নাসাগ্রে প্রাণ হৈল। ফসীহৎ (<আ০ ফজ়িহৎ = অপযশ) যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব। ... এ সময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক। নচেৎ আমার জান লোপ হৈল।

কিন্তু এই ইঙ্গিতে এসেই ইতিহাস পথ বদলায়। পাঁচ-ছ'শ বছরের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে মুখের ভাষায় সেঁধিয়ে যাওয়া হাজারাধিক ফারসি (+আরবি) শব্দ যে-স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় লিখিত ভাষার আঙিনাতেও চলে এসেছিল, কোনও যুগন্ধরের হাতে পড়ে তার শিল্পিত পরিণতি কী হ'তে পারত, তা আর দেখা হ'ল না আমাদের! বদলে, মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানে আমরা পেলাম এই শ্বাসরোধকারী সৌন্দর্যে থর থর গদ্যভঙ্গিমা -

> এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে। (*সীতার বনবাস*, খ্রি. ১৮৬০)

৩.

আগুপিছু ঠাহর করলে, ভাষার এই নজরকাড়া উল্লম্ফনকে অধুনা ফ্যাকাশে হয়ে আসা একটি শব্দ দিয়েই চিহ্নিত করা যায় - বিপ্লব! আর বিপ্লব যদি কোনও ভোজসভা না হয়, তবে তা কোনও ভোজবাজিও নয়। *অন্নদামঙ্গল* থেকে *সীতার বনবাস*-এর মধ্যবর্তী এক শতাব্দীর মানুষিক তৎপরতাগুলিকে সনাক্ত করতে না পারলে অথচ, এই রূপান্তরকে অনৈসর্গিক বলেই মনে হয়। ফারাক মাত্র এক শতাব্দীর। বাঙালির সামাজিক ও জাতীয় জীবন এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দেওয়া এক শতাব্দী! সেই বর্গির হাঙ্গামা (খ্রি.১৭৪২-১৭৫১) দিয়ে শুরু। তারপর পলাশির আমবাগান (খ্রি.১৭৫৭) আর জনাব ক্লাইভের দেওয়ানি প্রাপ্তি (খ্রি.১৭৬৫)। উঠন্ত মুলো পত্তনেই চেনা যায়। মধ্যযুগের 'অন্ধকার' ভেদ ক'রে আধুনিকতার 'আলোকায়ন' আনার পরবর্তী দু'শতক ব্যাপী কর্মসূচির প্রথম পাঁচ বছরেই ঘটানো গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর(খ্রি.১৭৭০) - যাতে নিকেশ হয়ে গেল এক কোটি বাঙালির প্রাণ!

এই বাংলা-উজাড় মারণযজ্ঞের ৮ বছরের মধ্যে হুগলি থেকে ছেপে বেরোল *A Grammar of the Bangal Language* (খ্রি.১৭৭৮)। রচয়িতা, কোম্পানির বাংলা-দক্ষ কর্মচারী নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড। ইংরেজিতে লেখা এই ব্যাকরণে ছাপার হরফে প্রথম ফুটে উঠল বাংলা ভাষার নমুনা। তাই আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ-বইটি জায়গা ক'রে নিয়েছে। হালহেড অবশ্য স্পষ্টতই এটি লিখেছিলেন তাঁর সতীর্থ ও অনুজ ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শেখাবার জন্য, 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং'। তাই মন্বন্তর এবং ব্যাকরণ, দুটিই ইংরেজের প্রশাসনিক কর্মসূচির ফলশ্রুতি।

বড়লাট হেস্টিংসের বন্ধুস্থানীয় মেধাবী হালহেড আরবি-ফারসি বিলক্ষণ জানতেন। টানা দু'বছর ধরে ফার্সি আইনগ্রন্থ ইংরেজিতে তর্জমা শেষ ক'রে তিনি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্টে ফারসি দোভাষীর কাজে যোগ দিয়েছিলেন (খ্রি.১৭৭৫)। কিন্তু হেস্টিংসেরই সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্যে প্রকাশিত তাঁর ব্যাকরণে (*GBL*) ফারসি-বিমুখতা ও সংস্কৃত-প্রবণতার ঝোঁকটিই প্রতিষ্ঠা পেল। অবশ্য তদানীন্তন বাংলায়, প্রশাসনিক, বিশেষত আইন সংক্রান্ত রচনাবলীতে, ফারসির প্রয়োগবাহুল্য এতটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, কোম্পানির উদ্যোগে প্রকাশিত এ-ধরনের বইগুলিও সে-ছোঁয়াচ বাঁচাতে পারেনি। এরকম তিনটি বই হ'ল জোনাথান ডানকানের দেওয়ানি আইন সংক্রান্ত ইম্পে বিধিমালার অনুবাদ (খ্রি.১৭৮৫), নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোনের ফৌজদারি আইনের অনুবাদ (খ্রি.১৭৯২) এবং হেনরি পিটস ফরস্টারের কর্ণওয়ালিস বিধিমালার অনুবাদ (খ্রি.১৭৯৩)। সংস্কৃতজ্ঞ ফরস্টার অবশ্য তাঁর স্বমূর্তিতে দেখা দিলেন *A vocabulary in two parts, English & Bengali and vice versa-*

র দু'টি খণ্ডে (খ্রি.১৭৭৫/১৮০১)। এক সংস্কৃতায়িত বাংলা শব্দকোষের উত্তরাধিকার ভূতের বোঝার মতো ঝুলে রইল অব্যবহিত পরবর্তী স্ফুটনোন্মুখ বাংলা গদ্যের ওপর।

বাংলাভাষার এই মোক্ষম মোচড়বিন্দুতে এসে একটি সংশয়দীর্ণ প্রশ্ন বুকের ভেতর থর থর ক'রে ওঠে। হালহেড-ফরস্টার প্রমুখ বিদ্বৎজনের এই সংস্কৃতমুখীনতা কি নিছক কাকতালীয় আপরুচির ফসল? নাকি তা ক্লাইভীয় সামরিক কূটকৌশলেরই এক সাংস্কৃতিক সংস্করণ?

বস্তুত মুরশিদাবাদের রবরবা, যা দেখে স্বয়ং ক্লাইভেরও চক্ষু চড়কগাছ হয়েছিল, ইংরেজ বানিয়াদের এক দীর্ঘমেয়াদি লুণ্ঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তাই শুধুমাত্র সামরিক বিজয় অর্জন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করেই তারা খুশি হননি। ইতিহাসকে তাঁরা এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করতে চাইছিলেন, যাতে বাংলার অসামরিক প্রতিরোধগুলিও ভেঙে পড়ে। তুমি খারাপ, তোমার মাটি খারাপ, তোমার জলহাওয়া খারাপ, তোমার বাপ-চোদ্দপুরুষ খারাপ! হ্যাঁ, ভালো কিছু ছিল বটে – সে সব সেই মান্ধাতার আমলে। মুসলমানরা তোমাদের দেশ কব্জা করার বহু আগে তোমাদের সেই তখনকার পূর্বপুরুষেরা আমাদের মতন আর্য। তোমাদের ভাষা, সে তো সংস্কৃতেরই ঘরের মেয়ে। আর সংস্কৃত – সে হ'ল আমাদের জননী লাতিনেরই তুতো বোন। তোমাদের এখনকার যাকিছু দুর্দশা, তার জন্য দায়ী ঐ নবাব-বাদশা আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। আমরা এসেছি, তোমাদের সাগরপারের ত্রাতা। আমরা তোমাদের সব দেব। শিক্ষা দেব, সভ্যতা দেব, জ্ঞানের আলো দেব, লোকহিতৈষণা দেব, সাম্য অব্দি দেব। আর বেআদবদের ফাঁসিতে লটকাব। তোমরা শুধু ভেন্ন হও। যত সব লেড়ে-পাতিলেড়েদের থেকে ভেন্ন হও। যাবনি মিশাল থেকে বাঁচো, ভাষাকে বাঁচাও!

হালহেড আর ফরস্টারের পাণ্ডিত্যের আড়াল থেকে হেস্টিংস-কর্ণওয়ালিসের হিসহিসে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে না তো!

এই ধন্ধকে দূরে সরিয়ে রেখে আমরা দেখি, ফরস্টারের অভিধানের দু'টি খণ্ড প্রকাশের মধ্যবর্তী অবকাশে মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন আর এক অমানুষিক প্রতিভা, উইলিয়ম কেরী। দীর্ঘ ৭বছরের ইতস্তত প্রয়াসের পর তিনি পা রাখলেন শ্রীরামপুরের মাটিতে এবং তৈরি করলেন মিশন ও ছাপাখানা (খ্রি.১৮০০, ১০ জানুয়ারি)। মাত্র ৮মাসের মধ্যে ছেপে বেরোল *মথি লিখিত সুসমাচার*, বাংলায়। পরবর্তী ৩৪বছরে ৪০টি বিভিন্ন ভাষায় ২১২,০০০ কপি বাইবেল প্রকাশ, তাও হাতেচালানো ছাপাখানা থেকে, ভাবা যায়! আর শুধু তো বাইবেল নয়, রামায়ণ-মহাভারত সমেত অজস্র বাংলা বই, অভিধান, ব্যাকরণ। যার অনেকগুলি কেরীর নিজেরই রচনা।

ঐবছরেই (খ্রি.১৮০০) ওয়েলেসলি পত্তন করলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এখানেও মধ্যমণি কেরী। কলেজের উদ্দেশ্য অবশ্যই সাহেব-কর্মচারীদের বাংলা সমেত অন্যান্য দেশীয় ভাষা শেখানো। কিন্তু শেখাবে কে? বই কই? ডাক পড়ল কেরীর। সংস্কৃত, বাংলা আর মারাঠি – তিন তিনটে ভাষা শেখানোর দায়িত্ব নিলেন তিনি। আর বাংলায় গদ্যবই লেখানো শুরু করলেন পণ্ডিত আর মুনশিদের দিয়ে। শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে ছাপা হতে থাকল সে সব বই। শুরু হয়ে গেল বাংলাগদ্যের পথ চলা।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, কেরীর তত্ত্বাবধানে ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত বাঙালি লেখকদের রচনাগুলিই তৎসম শব্দবাহুল্য ও সংস্কৃত রীতির অনুসারী বলে পণ্ডিতী গদ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যে-ভাষার কুজ্ঝটিকা ভেদ করতে পরবর্তী লেখকদের যথেষ্ট সচেতন প্রয়াস চালাতে হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এইসব লেখকেরা এবং কেরী নিজেও স্বাভাবিক বাংলায় যে যথেষ্ট সাবলীলভাবে লিখতে পারতেন তার নজির আছে।

ফো-উ-ক গ্রন্থমালার প্রথম বইটির কথাই ধরা যাক। কেরীর বাংলা শিক্ষক বা মুন্সি রামরাম বসু তাঁর পূর্বপুরুষকে নিয়ে লিখলেন *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (খ্রি.১৮০১)। এই রচনার আরবি-ফারসি বাহুল্য পণ্ডিতী রীতির একেবারে উলটোমেরুর স্পন্দন। প্রসঙ্গত, এটিই কোনও বাঙালির লেখা প্রথম ছাপা গদ্যবই। পরবর্তী রচনা *লিপিমালা*-য় (খ্রি.১৮০২) রামরাম সংস্কৃতমুখী। এ কি লেখকের আপন খেয়াল, না কি কোনও নীতি নির্দেশনার রূপায়ণ, কে জানে!

এ-প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁকেই পণ্ডিতী রীতির প্রধান পথিকৃৎ বলা হয়। তাঁর *বত্রিশ সিংহাসন* (খ্রি.১৮০২), *হিতোপদেশ* (খ্রি.১৮০৮), *বেদান্তচন্দ্রিকা* (খ্রি.১৮১৭)-র রচনারীতির অবলম্বন হ'ল সংস্কৃত আদর্শ। শুধুমাত্র তৎসম শব্দচয়নই নয়, সংস্কৃত বাকরীতির অন্ধ অনুকরণও এই আদর্শের চৌহদ্দিতে পড়ছে। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য প্রসঙ্গে রামমোহন পর্যন্ত লিখছেন –

> প্রগাঢ় ২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্যের অন্যথা করা হয়।
>
> (*ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার* - খ্রি. ১৮১৭)

অথচ এই মৃত্যুঞ্জয়ই যখন *রাজাবলি* (খ্রি.১৮০৮) লিখেছেন, তখন ইতিহাসের একেক পর্যায়ের বর্ণনায় একেক রকম রীতির ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হ'তে হয়। প্রাক্-সুলতানি রাজাদের বর্ণনায় তৎসমের অধিষ্ঠান, পাঠান-মুঘল আমলের বেলায় ফারসির প্রয়োগ, আবার ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাতের বিবরণে দু'একটি ইংরেজি শব্দেরও ব্যবহার ঘটেছে তাঁর কলমে। *প্রবোধচন্দ্রিকা* (রচনা

খ্রি.১৮১৩, প্রকাশ খ্রি.১৮৩৩)-র সংস্কৃতবহুল রচনারীতির ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকি মারে এরকম স্বতঃস্ফূর্ত টুকরো –

> ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, তবে কি আজি খাওয়া হবে না ক্ষুধায় মরিব। তৎপত্নী কহিল মরুক মানে আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়। দেখি দেখি হাঁড়িকুড়ি খুদকুড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদকুড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল শীলটা ভালো বটে লোড়াটা যাইচ্ছা তা। এতে কি চিক্কণ বাটা হয়। মরুক যেমন হউক বাটি ত।

এর তুলনায় বিদ্যাসাগরের *বেতাল পঞ্চবিংশতি*-র প্রথম সংস্করণের (খ্রি.১৮৪৭) ভাষাও বহুগুণ সংস্কৃতায়িত। পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর স্বয়ং যে-প্রবণতার সাথে লড়াই করেছেন।

৪.

আসলে প্রাচ্যের 'পবিত্র' ভাষা হিসাবে অগ্রিম চিহ্নিতকরণ সংস্কৃতকে ইংরেজ বুধমণ্ডলে যে বিশেষ আসন দিয়েছিল, এদেশী ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রকল্পেও তা ছিল 'দেবভাষা'। তাই সমকালীন কৌলিন্যের প্রতীক ফারসি-কৃতবিদ্যতার প্রতিস্পর্ধী এক নতুন অভিজাততন্ত্রের রচনায় ইঙ্গ প্রশাসকেরা যে সংস্কৃতকে কথঞ্চিৎ প্রশ্রয় দেবেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তাই কেরী যখন প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে ফো-উ-কলেজের সমাবেশে সংস্কৃতে বক্তৃতা করেন, তখন শাসক ও শাসিত দু'মহলেই ধন্য ধন্য পড়ে যায়। অথচ অন্বয় গড়বড় ক'রে ফেলা তৎসমবহুল বাংলায় রচিত তাঁর বাইবেল পড়ে একজন বাঙালিও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন কি না সন্দেহ! এই পরস্পরবিরোধী ঘটনাচক্রে চাপা পড়ে যায় কাশফুল ও ছেঁড়ামেঘের ছায়া বুকে নেওয়া শারদীয় নদীর মতো তাঁর এই লোকায়ত বাংলা –

> আজি আমি বড় দায়তে পড়িয়াছি। তুমি যদি দশটাকা কর্জ্জ দিয়া রক্ষা কর তবে সে রক্ষা পাই। তা নলে গরু বাছুর মাগ ছেলে সকল রাজায় বেচে নেয়।
> তোমার কয় হাল আছে আর জোত কয় বিঘা তোমার মালগুজারি কত লাগে। তাহা না বুঝিয়া টাকা কি মতে দিব।
> মহাশয় আমার পঁচিশ বিঘা জমি তাহার খাজানা মোক্তা পনেরো টাকা লাগে। তাহার মধ্যে পাঁচ টাকা দিয়াছি এখন বাকি দশ টাকা আছে। অতএব আপনি আমাকে ধানের উপর টাকা দিওন আমি মাঘ মাসে সুধ আধ আনা হিসাবে ও যে ভাও ধান বিকায় তাহা হইতে দুই কাঠা ফি টাকায় ধরতা নিব। আপনার টাকার ধান আগে খামারে মাপিয়া দিয়া যাহা পাই তাহা লইয়া যাব। (*কথোপকথন* - খ্রি. ১৮০১)

বদলে, আকাশ ছেয়ে ফেলে এমন এক দমবন্ধ ভাষাকাঠামো, যাতে সংস্কৃতের উপস্থিতি নিরঙ্কুশ। শুধু বেশুমার তৎসম শব্দের উপস্থিতিই নয়, কখনও কখনও তাদের নিছক আভিধানিক প্রয়োগ, সন্ধি ও সমাসের আড়ম্বর মেঘডম্বরের মতো বাজতে থাকে –

১.সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লারাজীব – মৃত্যুঞ্জয়

২.পুন্নাগনাগকেশরাগুরুভাণ্ডীরাশোক-শোভিতবনসুন্দরীগণবিলাসিতাত্যন্তমনোহর দ্বিরদাস্পদ নামে বন – কেরী

বিভক্তি ও প্রত্যয় প্রয়োগে সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্ধ অনুসরণ আর সরল বাক্যের বদলে জটিল বাক্যের ক্রমিক ব্যবহার, আমাদের বাংলাভাষাকে যেন দীর্ঘবাহু গাছেদের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া পায়ে-চলা পথটির মতো ক'রে তুলেছিল।

বিদ্যাসাগরের মতো প্রতিভাধর লেখকের নিরুপায়তা অতঃপর আমরা বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, কোন্ ভাষাকাঠামোর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কলম তুলে নিয়েছিলেন। *বেতাল পঞ্চবিংশতি*র প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত 'প্রাড্ভিবাক পুত্রকে', 'উৎকণ্ঠাকুণ্ঠিত', 'উৎকলিকাকুল' শব্দগুলিকে নির্মোহ বিচারে বাতিল করতে তাঁকে দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি অনায়াসে নিয়ে আসেন 'অমাত্যপুত্রকে', 'অতিশয় বিষণ্ণ', 'উৎকণ্ঠিত'। প্রথম সংস্করণের 'অরণ্য প্রবেশ পুরঃসর' দ্বিতীয়ে হয়ে যায় 'অরণ্যে গিয়া'।

পরবর্তী ইতিহাস তো আমাদের সবারই জানা। আকাশছোঁয়া প্রতিভার অধিকারী নানান লেখকের হাতে বাংলা গদ্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা লাবণ্যময় তনুশ্রী পেয়ে গেল। লেখ্য বাংলায় লক্ষণীয়ভাবে কমে এল তৎসমের প্রয়োগ । বাংলা শব্দ (তদ্ভব/অর্ধতৎসম, দেশী) আর অতিথি বা কৃতঋণ শব্দের প্রয়োগের কত নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল উনিশ-বিশ শতকের মহাজনদের হাতে। আরও কত নিরীক্ষার আর স্বাভাবিক গ্রহণ-বর্জনের পুলকিত অভিজ্ঞতা পড়ে আছে এই ভাষার সামনে – আমাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মৃত্তিকার আগামী কালপ্রবাহের বয়ানের মতোই রোমাঞ্চকর তা!

আশ্বিন ১৪০৮

মানুষজনকে সাক্ষী মেনে স্বগতোক্তির রেওয়াজ আমাদের সাবেক নাট্যে আছে। সেই অছিলায় হাঁসেদের মধ্যে বকের মতো উড়ে এসে পড়লাম, প্রায় রবাহূত। আমার এই নিরুপায় বকবকানিটুকু আসলে নিজের সাথে নিজেরই এক কথকতা। যে-কথাগুলি নিজেও জানি না স্পষ্ট, হয়তো সেগুলিই ঠাহর করার কিছুটা মরিয়া প্রয়াস মাত্র। নিজগুণে যদি না-ও কানে তোলেন এই কাল্পনিক সংবদন, আপনাদের সালাম ও প্রণাম।

প্রথমেই জানাই, এই কথকতায় স্রেফ আমাকেই বাঙ্ময় মনে হলেও, আমার চারপাশে ভিড় করে আছেন অজস্র ছায়ামূর্তি। যাঁরা সকলেই এ-কথকতার প্রণম্য কুশিলব। যেমন ধরুন গঙ্গাদাস। আসুন, গঙ্গাদাসের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। বাবা গঙ্গাদাস, কোথায় তুমি? হরি বল, হরি বল - ঐ দেখুন, হরিনাম শোনামাত্র ছুটতে ছুটতে এসে হাজির গঙ্গাদাস।

টোলের পণ্ডিত গঙ্গদাস ঠাকুরের ওপর চটেমটে পুঁথিপত্তর ছিঁড়ে ডানপিটে নিমাই নবদ্বীপের এক পথকুকুরের নাম রেখেছিলেন, গঙ্গাদাস। এখন সেই সরমাসন্তান নিমাইয়ের বড় নেওটা। তাকে বড় সামান্য ভাববেন না -

প্রভু বলে এ কুকুর আছিলা ব্রাহ্মণ।
বৈষ্ণবনিন্দক বড় বেদপরায়ণ।।
বৈষ্ণব মাগিলে অন্ন না দিলেক তারে।
বেদনিন্দ্য শূদ্রে অন্ন খাবে মোর ঘরে।।
প্রলাপে বৈষ্ণবে দ্বিজ উচ্ছিষ্টান্ন দিল।
সেই শাপে নবদ্বীপে কুক্কুর হইল।।

হায় জয়ানন্দ, আপনি কি আমার কথাই লিখেছেন চৈতন্যমঙ্গল-এ! ঐ বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণই কি তবে আমি? তবে সে আমি ভালোই করেছি। কী ক'রে বৈষ্ণবকে অন্ন দেব - ও তো বেদ মানে না, ও শূদ্র। ওর এতবড় স্পর্ধা, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে অন্নগ্রহণের স্বপ্ন দেখে! ওরে হতভাগা নীচুজাত, খাবি তো উচ্ছিষ্ট খেয়েই ধন্য হ'।

কিন্তু জয়ানন্দ, তাই বলে আপনি আমায় কুকুর বানিয়ে দিলেন! একি আপনার পক্ষপাত নয়, তত্ত্বায়িত দৃষ্টিভঙ্গি নয়? জানি, আপনি বলবেন, শৈশবে আপনার নাম ছিল গুইয়া(<গুয়ে)। আর স্বয়ং চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে ফেরার পথে আপনার পিতার আতিথ্যে থাকার সময় আপনার নাম পালটে করেছিলেন, জয়ানন্দ। তাই আপনার বর্ণিত গঙ্গাদাস গৌরভজনা ক'রে মুক্তি পেয়ে যায় -

গৌরচন্দ্র ভজন করিয়া অবশেষ।
কর্মবন্ধ কুক্কুরের পাপ হৈল শেষ।।
কথোদিনে কুকুরের শাপান্ত ঘুচিল।
গঙ্গাএ প্রাণ ছাড়ি কুকুর মুক্ত হৈল।।
আশ্চর্য দেখিয়া নবদ্বীপ লোকে ত্রাস।
গৌরাঙ্গপ্রসাদে মুক্ত কুকুর গঙ্গাদাস।।

কিন্তু এতবড় আনন্দের ঘটনায় নবদ্বীপের লোক ত্রস্ত কেন! কারা ত্রস্ত? চৈতন্যের উত্থানে কারা ত্রস্ত জয়ানন্দ? সে কি ওই বেদপরায়ণদের দলবল! নাচে-গানে মাতোয়ারা বৈরাগীর ভাবোন্মাদনায় এত ভয়! আপনিই আবার সংসার ছেড়ে পথের ধুলায় নেমে আসা সেই মানুষটির অদ্ভুত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার কথাও শুনিয়েছেন। মহাপ্রভু তখন নীলাচলে। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের খেয়াল হ'ল গৌড়বাংলা আক্রমণ করবেন, চাইলেন তাঁর অনুমতি। গৌড়ের সিংহাসনে তখন স্বনামধন্য রাজা হোসেন শাহ। সামগ্রিক শক্তিতে প্রতাপরুদ্র যে হোসেনের তুল্যমূল্যই নন, একথা চৈতন্যদেবের কাণ্ডজ্ঞানে সুস্পষ্ট। তাই এ-কুবুদ্ধি থেকে তিনি নিবৃত্ত করতে চাইলেন প্রতাপরুদ্রকে –

প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশা।
শুনিঞা গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাসা।।
চৈতন্যদেবেরে রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলে প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল।।
কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর।
সিংহ শার্দ্দুলে দেখ কতেক আন্তর।।
উড্রদেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবেন এতদিনে।।
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভোজন পাছে কর।।

একজন ভাবোন্মাদ ব্যক্তির কী অসাধারণ সামরিক দূরদৃষ্টি! এমন মানুষকে ভজনা করে সত্যিই বুঝি শাপমুক্ত হওয়া যায়। অথচ জয়ানন্দ, আপনিই শুনিয়েছেন নিমাইয়ের মানবিক মৃত্যুর কথা, পায়ে ইটের টুকরো ফুটে গিয়ে সেই কালাতিক্রমী ব্যক্তিত্বের জীবনাবসানের এক ঐহিক ইতিবৃত্ত। অজস্র অদৃশ্য সুতো দিয়ে আমার আজকের আমি-কে কি এইসব ইতিবৃত্ত বেঁধে রাখেনি! এই-ই তো আমার ইতিহাস। আর একেই বঙ্গোপসাগরের পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে আমায় বিশ্বায়িত হতে হবে? তবু কি আমার কুকুরজন্ম ঘুচবে জয়ানন্দ?

২.

ভুলতে কি পারি গুঞ্জাফুলের মালা গলায়, ময়ূরের পেখম পরা আমার আদি জননী সেই সহজ সুন্দরী শবরী নারীকে, শবরপা যাঁর ছবি এঁকে রেখেছেন এইভাবে –

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালি।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।

ভুলতে কি পারি অবহট্ট কবিতার সেই গৃহস্থ চিরপুরুষটিকে? যিনি কলাপাতায় ওগরা ভাত (একসাথে সেদ্ধ চাল-ডাল) খাচ্ছেন গাওয়া ঘি দিয়ে, সঙ্গে ময়না মাছ, নালতে (পাট)শাক আর জুতসই দুধ। পুণ্যবান হয়ে উঠছেন তিনি স্ত্রীর পরিবেশনার সৌন্দর্যে –

ওগ্গর ভত্তা রম্ভা পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা
মোইনি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খা পুণবন্তা।।

তবু ছবিগুলি ছিঁড়েও যায়। নির্দয় দস্যুরা আসে। বারে বারে আসে। দঙ্গল বেঁধে এসে দেশ লুটে নেয়। কখনও জলপথে, বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়ে পদ্মাখাল বেয়ে, যেমন ভুসুকু দেখেছেন –

বাজণাব পাড়ী পউয়া খালে বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।।

কখনও বা শতাব্দী পার হয়ে তারা আসে যোজন যোজন পথ ধেয়ে স্থলপথে –

মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুঠে নেএ আর সব ছাড়া।।
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
এক চোটে কারু বধএ পরাণ।।
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ।।
একজন ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করে।।

ভুসুকুর জলদস্যু আর গঙ্গারাম দত্তের এই স্থলদস্যুর 'অদয় দঙ্গল', এ কি আমার ইতিহাস নয়? তবে গঙ্গারাম, আপনি বেঁচে গেছেন। আপনার *মহারাষ্ট্র পুরাণ*-এ (১৭৫১খ্রি) নিষ্ঠুর গণধর্ষণের এই বিবরণ লিখতে আর বছর ৫০ দেরি হলেই আপনাকে হয়তো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় ঘরানার লেখক বলে খারিজ করা হ'ত। কিন্তু বণিকপত্নী মাধবী, আপনার কী অভিযোগ? শুনুন, ঘৃণায় ও ধিক্কারে আমি ও আমার স্বামী একসাথে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতে চলেছি। রাজমহিষী বল্লভার ভাই কুমারদত্ত দীর্ঘদিন ধরে আমায় উত্যক্ত করছে। আমার স্বামী ও শ্বশুরকে কৌশলে আটক করে রেখে সে রাতের বেলা জোর ক'রে আমার বাড়িতে ঢোকে। তারপর আমার পরনের কাপড় ধরে টান মেরে সোজা আমার বুকে হাত দেয় এবং ভালো ভাষায় বলতে গেলে স্তনমর্দন করে। আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করি এবং কোনওরকমে ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচি। কিন্তু রাজশ্যালককে বিচার করবে কে? রাজসভায় আমি কোনও বিচারই পেলাম না। বরং রানি স্বয়ং সভায় এসে আমায় পদাঘাত করলেন। লক্ষণসেনের এই রাজত্বে স্বামীর সঙ্গে সহমরণই আমার নিয়তি। ওগো, সাহেবদের দেশ থেকে জ্ঞানের আলো এসে পড়ায় আলোঝলমল আধুনিক ও পরাধুনিক মানবতাবাদী বাবুবিবিসকল, দয়া ক'রে আমায় সহমরণে বাধা দিও না। আচার্য হলায়ুধ মিশ্র, আপনাদের ৩৩ কোটি দেবদেবতা এতবড় অনাচার দেখেও চুপ ক'রে রইলেন? দ্যাখো বাপু, এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। তোমার ওই গালগল্পে ভরা *শেকশুভোদয়া* আমার জীবৎকালের অন্তত ২০০ বছর পরেকার একটা জাল বই। হ্যাঁ, মানে জাল হলেও, এ তো হাল আমলের কোনও কারচুপি নয়, কমসেকম ৫০০ বছরের বনেদি জাল! কিন্তু রামাই পণ্ডিত, আপনি ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন কেন? আপনার হাতে ও কী পুঁথি - *শূন্যপুরাণ*! কী বলছেন, দেবতারা চুপ ক'রে ছিলেন না? তাজ্জব ব্যাপার -

ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএ ত কাল টুপি হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয় খোদায় বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার মুখেত বলে ত দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন আনন্দেতে পরিল ইজার।।

এই আনন্দের কার্যকারণ পরম্পরা কি আমার আজকের আমিকে এফোঁড় ওফোঁড় করেনি? আমার তো সবই কেড়েছিলে প্রভু। বাকি ছিল এই অন্তঃশীল ইতিহাসটুকু। একেও আজ কেড়ে নিতে চাও! কেড়ে নিতে চাও পেট-চোপসানো চোখ-কোটরে-ঢোকা ভেঙে পড়া শরীরের সেই অভুক্ত শিশুদের ছবি, যারা আকুল হয়ে খাবার চাইছে আর তাদের দীনহীনা মা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কেবলই

জপে যাচ্ছে যাতে এক কুনকো চালে একশ' দিনের অন্নসংস্থান হয়ে যায়। বাঙালি কবি বার, তাঁর এক কীর্ণ সংস্কৃত কবিতায় এঁকে গেছেন এই ছবি। বার-এর দু'একশতক আগেই অবশ্য প্রাকৃতজনের ভাষায় ঢেণ্ঢণপাদের চর্যাগানে পেয়ে যাই আর এক হাভাতের ছবি –

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জা অ।
দুহিলু দুধু কি বেণ্টে সমাঅ।।

পটমঞ্জরী রাগে এ-গানের কথা বাংলার মাঠে-ঘাটে-টাঁড়ে-জঙ্গলে-নদী-নালায় ভেসে বেড়াল শতাব্দীর পর শতাব্দী। তবে না স্বয়ং অন্নপূর্ণা মুখ তুলে চাইলেন। পলাশীর যুদ্ধের তখনও ৫ বছর বাকি। গাঙ্গিনীর তীরে খেয়া নৌকা নিয়ে বসে আছেন ঈশ্বরী পাটুনী। অন্নপূর্ণা এসে উঠলেন সেই নৌকায় কুলীন কুলবধূর ছদ্মবেশে। তারপর তাঁর পায়ের ছোঁয়ায় যখন কাঠের সেঁউতি সোনা হয়ে গেল, ধরা পড়ে গেছেন তিনি। তখন বর দেওয়া ছাড়া আর কীই বা করার আছে তাঁর। বলো পাটুনী, কী চাও তুমি – বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব। হায় পাটুনী, নাজিরি-উজিরি-নায়েবি-গোমস্তাগিরি কিছুই চাওয়ার সাহস হ'ল না তোমার? ঢেণ্ঢণপাদের অন্নাভাবের আতঙ্ক এতদূর তাড়া করে এসেছে তোমায় –

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।

কিন্তু রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, আপনার দেবী কথা রাখতে পারলেন কই! নইলে আরও দুই শতাব্দী পরে অভিমান-ঝঙ্কৃত আপনার এক উত্তর-সন্তানকে এইভাবে গুমরে উঠতে হয়? –

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা।।
অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।
সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে

ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।।
(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৯২০-৮৫ খ্রি)

কিংবা আরও একজনকে ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়তে হয় এইভাবে? –

ভাত দে হারামজাদা, তা-না হলে মানচিত্র খাব।।
(রফিক আজাদ, জ. ১৯৪৩ খ্রি)

এ কি আমার ইতিহাস নয়?

৩.

কতটুকু জান বাপু তুমি তোমার ইতিহাসের! নদীর মাঝে মাঝে কত চরা, কত ডাঙা, কত ঘুঘুর বাসা। নদীটাই মরে যাচ্ছে কখনও – গলা টিপেও তো মেরে ফেলা যায়। নইলে আমাদের কথা ভুলে গেলে বেমালুম! তোমাদের কথা? তোমরা আবার কোন তোমরা? আমরা কাঙ্গালিয়া জাঙ্গালিয়া। কী, নাম শোননি তো! সেন-জমানার জুলুমের জবাবে তো দেবতাদের ইজের পরিয়ে ছাড়লে। কিন্তু জুলুম কি থেমে গেল ভেবেছ –

দেশ গেল ছারেখারে ধর্ম হইল নাশ।
দারুণ দেওয়ান করে নারীর সর্বনাশ।।

শোনো বাছা, আমরা কিন্তু পেগম্বর-অবতারের ভরসায় বসে থাকিনি –

কাঙ্গালিয়া ডাইক্যা কয় – জাঙ্গালিয়া ভাই।
পরতিকার লাইগ্যা চল গেরামে গেরামে যাই।।
...
কাঙ্গালিয়া জাঙ্গালিয়া গেরামে গেরামে ঘুরে।
দেশের সকল লোক একজোট করে।।
নমো দাস হালুয়া দাস জালুয়া যত ছিল।
দেশের সকল পরজা একজোট হইল।।
...
জালুয়া হালুয়া নমো এক হয়্যা গেল।
লড়াই করবার লাইগ্যা জাঙ্গীরপুর চলিল।।

উরিব্বাস, এ যে রীতিমতো জনযুদ্ধ! হ্যাঁ, তা প্রায় শ'চারেক বছর আগেকার ব্যাপার হবে। লিন-পিয়াও সাহেবের নানাজানের নানাজানও হয়তো জন্মাননি তখন। তা কাণ্ডটা কী দাঁড়াল শেষমেশ? শুনবে? –

ফুলেশ্বরী নদী আর জালিয়ার হাওড়ে।
বিষম লড়াই হইল জলের উপরে।।

দেওয়ানের কামানের নাও সব ডুইব্যা গেল।
পাঠান সিপাই সব ছুট্যা পলাইল।।
দেওয়ান সাব পলাইয়া গেল দেশ ছাইড়ে।
জালুয়া হালুয়া নমো লড়াই ফতে করে।।

কে জানত, এ-ও আমার ইতিহাসের চোখের জলে ঝাপসা হয়ে-যাওয়া এক পাতা, নাম-না-জানা কোন কবির *রাজকন্যা রূপবতীর উপাখ্যান*-এ মুখ লুকিয়ে রয়েছে ৪০০ বছর! প্রণাম আপনাদের কাঙ্গালিয়া-জাঙ্গালিয়া। আপনারা এক লড়াই ফতে করলেন, অন্য কোথাও হয়তো শুরু হ'ল অন্য কোনও লড়াই, অন্য কোনও দিন। লড়াইয়ের কি শেষ আছে? হেরে ভূত হয়ে গেলাম কত শত বার। সূর্য ডুবল কোন আমবাগানে, সূর্য উঠল কোন শিশিরের ডগায়। গলায় তবু লেগে রইল আকাশ-ছেঁড়া গানের ছোঁয়া। নদীপ্রান্তর-বনমর্মর থেকে উঠে আসা সেই কথা আর সুরের হাহাকারে মনে হয় শত শত যুদ্ধের স্মৃতি ম্লান ক'রে ওই উড়েছে আমাদের জয়ের নিশান।

গানের ভিতর দিয়েই তবে ভুবনখানি দেখি একটু। সেই যে পটমঞ্জরী রাগের কথা হচ্ছিল, মনে হয় চর্যাগানের কবিদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল এই রাগ। তাই হয়তো রাগটি *চর্যাগীতিকোষ*-এ সবচাইতে বেশিবার ব্যবহৃত হয়েছে, ৫০টির ভেতর ১২টি পদে। এই সুরে বাঁধা ১টি পদ *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এও পাওয়া যায়। অথচ আজ এই রাগটি প্রায় বিলুপ্ত এক অপ্রচলিত রাগ মাত্র। এমন হারিয়ে যাওয়া রাগের মধ্যে চর্যাপদে পাচ্ছি গৌড়া (২টি পদ), শবরী (২টি পদ) এবং বঙ্গাল (১টি পদ)। কী আশ্চর্য, বঙ্গাল সুর লাগানো পদটি আবার ভুসুকুর রচনা, সেই ভুসুকু, যিনি অন্য একটি পদে উচ্চারণ করে গেছেন সেই অবিস্মরণীয় আত্মপরিচয় - আজি ভুসুকু বংগালী হইলি... । ওই হারিয়ে যাওয়া বঙ্গাল রাগের মতো এই আত্মপরিচয়টুকুও কি হারাতে হবে আজ! বঙ্গাল রাগে একটি পদ অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এও রয়েছে। তার চেয়ে ঢের বেশি আছে অবাক ক'রে দেওয়া এক রাগের ব্যবহার - ভাটিয়ালি।

ভাটিয়ালি কি তবে স্বতন্ত্র একটি রাগ হিসাবেই চিহ্নিত হয়াছিল সেদিন? অন্তত একটি স্বতন্ত্র সংগীতরীতি হিসাবে পূর্ববাংলার এই গান খ্রি.১২শ শতকের সময়েও এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, রাঢ়বাংলার কবি বড়ু তাকে ব্যবহার করেছেন ১৭টি গানে। আর ভাটিয়ালি সুর-লাগানো পদগুলির চলন আজকের ভাটিয়ালির মতোই যেন। এ তো আজও লুপ্ত হয়নি। দেখা যাক রাধাবিরহের এই পদটি -

এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে
তারে উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে
নিন্দিত এড়িঞা গেল মোরে।।১।।

বড়াই গো
কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে মরিলোঁ ল।
আনি দেহ শ্রীমধুসূদনে।।ল।।ধ্রু।।
আহোনিশি একমনে চিন্তো মোঞেঁ সব খণে
সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়ো দুতী আণী দেহ প্রাণপতী
তার মোর হউ দরশনে।।২।। ইত্যাদি

এই যে হারিয়ে না-যাওয়া ভাটিয়ালি - একে আঁকড়ে ধরেই কি মরা গাঙে পাল তুলে তরী ভাসাতে পারি না আর একবার? পশ্চিমী বিত্তায়নের এই চাপের মধ্যেও, আমার সামান্য নিরহঙ্কার ইতিহাসকে আশ্রয় ক'রেই কি ফিরে পেতে পারি না, ছোট্ট ঘাসফুলের মতো তিরতিরে হাওয়ায় নেচে ওঠার অধিকার? এইই তো পশ্চিমী আধুনিকতার বিরুদ্ধে আমার সামান্য প্রতিবাদ। আসলে আধুনিকতাই তো আমায় ইতিহাসবিস্মৃত করেছে। ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে, প্রবহমান একটি নদীর ধারার যে-সামান্য ধমনীস্পন্দন আমি বহন করছি, সেটুকুও। তারপর সেই স্মৃতিভ্রংশ আমাকে স্থাপন করেছে তার খেয়ালখুশির সঞ্চারপথে। আর আজ যদি কোনও পরাধুনিক আমার শিকড়সন্ধানের অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিতে চায়, নানান তাত্ত্বিক মোহজাল বিস্তার ক'রে, তবে ভাঙতে দাও এ আমির আবরণ। একবার অশ্রুভরা কণ্ঠে গাইতে দাও - ওরা চাহে না তোমারে চাহে না যে / আপন মায়েরে নাহি জানে।

৪.

এই নাহলে প্রাচ্যদেশের আবেগ! তোমার ওই ভাটিয়ালির ভাঙা নৌকার বুক-ফাটা-হাহাকারে পাল তুলে কি দুনিয়াদারির সাতসাগরে পাড়ি দেবে? শুধুই কি ঝাঁকে ঝাঁকে হাঙর-কুমির-তিমি, এসে পড়ছে লাখে লাখে হার্মাদের উড়ন্ত আগুনের গোলা। ঢেউ উঠছে আকাশের মাথা ছাড়িয়ে, আছড়ে পড়ছে নিজেরই নাভির অন্ধকারে। এই প্রলয় পয়োধি জলে কোন কূর্ম অবতার ভুস ক'রে ভেসে উঠে বামাল সমেত বাঁচাবে তোমায়? দিগন্তছেঁড়া হাওয়ায় পাক খেয়ে উড়ে গেছে তোমার ওই সাধের ইতিহাসের আখর। লোনা জলে ভিজে ভূত হয়ে গেছে ওই আষাঢ়ে গল্পের দাদা-দিদিরা। চলো, তাদের নুন মাখানো লাশ টাঙিয়ে দিয়ে আসি কোনও এক জিন্দাবাহার লেনের মন্থর আলোথামে।

বোলো না, ওভাবে বোলো না। চোখ বন্ধ ক'রে এক ইতিহাসবিহীন পৃথিবীর কথা ভাবতে চেষ্টা করি। ভয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, কোনও

নিষ্ঠুর মহাকাশযান আমায় নামিয়ে দিয়ে গেছে অজানা এক গ্রহের নেড়া রুক্ষ প্রান্তরে। এই বিশ্বচরাচরে আমি কি তবে একা? আমার প্রেক্ষিত বলে কিছু নেই? আমি কি স্বয়ম্ভূ? ঈশ্বরের মতো স্বরাট? এই ভয়ঙ্কর ঈশ্বরের হাত থেকে আমায় রক্ষা করো দেশকাল। ওগো কালপরী আর নিদ্রাপরী, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো সেই মৃত্তিকা আর জলের মহাকবিতায়, সেই ছায়াচ্ছন্ন উদ্ভিদের শোভায়, সেই কীটপতঙ্গমাছপাখিপশুদের ধারাভাষ্যে, সেই মানুষ ও মানবের অবিমিশ্র লীলাসংকীর্তনে। এই অনন্ত সংগীতের ধারাবাহিকতার ঝর্নাতলায় মাথা নিচু ক'রে না-দাঁড়ালে আমার বেঁচে থাকার কোনও অর্থই নেই। প্রাণ ও প্রকৃতির এই দীর্ঘতম সঞ্চারপথই আমার রচয়িতা - আমার শ্বাসবায়ু, চালিকাশক্তি, আমার ধমনীস্পন্দন।

সবসময় আমি হয়তো কোনও গন্তব্যে পৌঁছে উঠতে পারি না, চাইও না হয়তো। তবু তো চলতেই থাকতে হয়। আর সেই চলার পথে আমার মুঠোর মধ্যে ধরা থাকে একটা ছোট্ট সোনার কৌটো, আর কৌটোর ভেতর গুনগুন করে চলে এক মনভ্রমরা। ঐ ভ্রমরটুকুই যেন আমার ভেতর ঠিকরে পড়া আবহমান মানুষের প্রাণস্পন্দ। তার এতদিনের চলার, এতোল বেতোল চলার, ছন্দোবদ্ধ চলার, কান্নাভেজা চলার, পথ-হারানো চলার, জয়ের নেশায় চলার, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলার এক সাঁটলিপি লেখা ঐ ভ্রমরের ডানায়। যাঁরা বলেন, আমাদের এই মন-ভ্রমরার নাভিশ্বাস উঠেছে, তাঁদের আসলে পথিকতাতেই না-বিশ্বাস।

তবু মানুষের আয়ু আরও দীর্ঘতর, আর শেষ বিচারে আমরা সবাই, এই গ্রহের সমস্ত মানুষ, একই নিসর্গের সন্তান। সেই নিসর্গ থেকে আমি অবধি কীভাবে, আর আমি থেকে তুমি অবধি কীভাবে, অর্থাৎ আমি কীভাবে আমার কাছে এলাম আর কীভাবেই বা তোমার কাছে যাব - এই প্রশ্নদুটির শূন্যতার ভেতরেই আঁকা আছে আমার ধূসর পথের, মুছে যাওয়া পথের, টের না-পাওয়া পথের, ভাঙা পথের রাঙা ধুলোর কোমল করুণ আস্বাদ।

এই আস্বাদটুকু আমায় পেতেই হবে। আমাকে যে আসতেই হবে আমার নিজের কাছে। আমাকে যে যেতেই হবে তোমার নিবিড়ে। আমাদের সবাইকেই।

মাঘ ১৪১১

অনন্তের অস্পষ্ট আভায়

জগদীশ গুপ্তের একটি গল্পে আমরা এক প্রবীণা গৃহকর্ত্রীর দেখা পেয়েছিলাম, সাংসারিক পরিপূর্ণতা আর সমৃদ্ধির আলোবাতাসের করপুটে সুস্থাপিত থেকেও যিনি প্রায়ই বলে উঠতেন - মরণ হলেই বাঁচি! কোনও ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রেক্ষিত থেকে উৎসারিত হ'ত না তাঁর এই বিধুর উচ্চারণ। এ ছিল মানুষটির নিতান্তই এক মুদ্রাদোষ। আমরাও, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, সংস্কৃতিবাহিত নানান সংস্কারে, অমন নানান মুদ্রাদোষে নিজেদের আচ্ছন্ন ক'রে রাখি। এর মধ্যে একটি জনপ্রিয় সংস্কার হ'ল, নিজেকে নির্যাতিত অনুভব ক'রে, আনন্দ পাওয়ার সংস্কার।

কিছু মানুষ অবশ্য রয়েছেন, যাঁরা আত্মনির্যাতনের ভেতর দিয়েই কোনও এক পূর্ণতার প্রকল্পের দিকে পৌঁছাতে চান। তাঁদের এই সান্ধ্যচর্যা যদি বা উন্মার্গ বলেও বিবেচিত হয়, তবু অনস্বীকার্য, তাঁরা আপরুচি কোনও না কোনও এক মার্গের অনুসারী। পছন্দসই পরমতার অনুধ্যানে তাঁরা চয়ন ক'রে নেন কিছু স্বারোপিত আচরণবিধি। আত্মজীবনীর সংকটে-সংশয়ে সেগুলির চর্চা করেন নিরবধি আন্তরিকতায়। ভুল হোক ঠিক হোক, নিজেদের নির্যাতিত ক'রে তাঁরা হয়তো কিছু মূল্য দিতে চান ব্যক্তিক অকৃতার্থতার মর্মবেদনার অন্ধকারকে। হয়তো এভাবেই এক আনন্দিত আলোকাভিসারেরও সন্ধান পান তাঁরা।

সে-আনন্দের অনুভূতির ভেতর তবু এক সক্রিয়তার সঞ্চারপথ প্রচ্ছন্ন রয়েছে - নিজেকে নির্যাতিত করার সক্রিয়তা। কিন্তু নিজেকে নির্যাতিত অনুভব করার ভেতর তো তেমন কোনও আত্মিক উদ্যমেরও প্রকাশ নেই। বরং, 'আমি নির্যাতিত', একথা ভেবে আনন্দ পাওয়ার মানসিকতাতে কি আগাপাশতলা জড়িয়ে থাকে না, নিছকই আমাদের অস্মিতার নিরঙ্কুশতা? এমনকি এভাবে যদি কেউ বিষাদ-আক্রান্তও হয়ে পড়েন, সেই বেদনার ভারও যেন, মনে হয়, অহং আহত হওয়ারই এক চেহারা-বদলানো স্ফূরণমাত্র।

প্রকৃতির কাছ থেকে আমার প্রাপ্তিটা যে ঢের বেশি, এবং বিনিময়ে, আমার দিক থেকে কিছুমাত্র প্রতিদানের বহর যে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর - স্মরণে-মননে এ-কথাটি যখনই আর বহন ক'রে চলতে পারি না, তখনই আমার ভেতর অহংয়ের বাস্তুঘুঘুটি মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসে। তখন রচিত হতে থাকে অপ্রাপণীয়ের ফর্দ। আর সেসব অনাদায়ী প্রস্তগুলির জন্য জমতে থাকে ক্ষোভ। ক্ষোভ প্রশমনের জন্য, তাকে গৌরবদানের জন্য, আরোপিত হতে থাকে নানাবিধ নির্যাতনের অভিভাব। আর নির্যাতনের অস্তিত্ব একবার স্বীকৃত হ'লে, অবধারিত বা বিমূর্ত নির্যাতনকারী/রাও বিবেচিত হতে থাকে একাদিক্রমে। এইভাবে আমার তাবৎ অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ এক/বহু প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে অহংতৃপ্তির মহামোক্ষ তার বিজয়নিশান উড়িয়ে দেয়।

অথচ চোখ মেললেই দেখি, প্রকৃতির কোনও প্রান্তেই পূর্ণতার কৃতার্থতা স্পর্শ করার পথ কিছু মসৃণ ক'রে গড়া নেই। একটি ল্যাংড়া আমকে তার বর্ণ-গন্ধ-স্বাদের অনবদ্যতায় উপস্থাপিত করতে বৃক্ষমাতাকে সেই বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গমের পর্যায় থেকে কেবলই ধারাবাহিক বাধা টপকাতে টপকাতে আসতে হয়। আঁটির শক্ত খোলসের 'নির্যাতন' ভাঙতে হয় সামান্য শিশুকে। কাণ্ড আর শাখা-প্রশাখাগুলিকে নিজেদের উচ্চতা ও বিস্তার কেবলই অতিক্রম ক'রে যেতে হয় দীর্ঘদিন পর্যন্ত। এছাড়াও আসে অভাবিত বিপর্যয়গুলি, অভাবিত কিন্তু অনিবার্য। কালবৈশাখীর উন্মত্ত তাণ্ডবে প্রত্যঙ্গবিচ্ছেদের বেদনা বা কীটদষ্ট সহস্র মুকুলের জন্য শোকের অনুভূতি, এমন সমস্ত যন্ত্রণাগুলি আত্মসাৎ করেই তরুজনয়িতা তাঁর আশ্চর্যতম সৃষ্টিগুলিকে পরিণতিতে পৌঁছে দেন। প্রতিটি আমের মজ্জার মধুতে এইভাবে মিশে থাকে নির্যাতনের মর্মবস্তুগুলি।

বিশ্বচরাচরের প্রতিটি স্পন্দন, প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গ, যেন এইভাবে প্রতিমুহূর্তে আমাদের শুনিয়ে যাচ্ছে নিজেকে অতিক্রম করার আহ্বান। সেই মহাসংগীতের নির্যাসে যদি কিছুমাত্রও রণিত হই আমরা, যদি নিজের ভেতরের যা কিছু তুচ্ছতা-সংকীর্ণতার আলোহীন নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে পারি নিজেদের, হৃদয় থেকে একদিন হয়তো খুলে যাবে কোনও অদেখা রুদ্ধ দুয়ার। আবছা আভাসে হয়তো তখন মর্মলোকে ফুটে উঠবে একটি পথের বিস্তার, আত্মিক মুক্তির দিকে পা বাড়ানোর। তখন হয়তো, অন্তত ব্যক্তিগতস্তরে, আমরা এমন একটা শক্তি অর্জন করতে পারব, যার জোরে বাইরের নির্যাতনগুলিও আর ততদূর অপ্রতিরোধ্য ঠেকবে না আমাদের কাছে।

হয়তো তখনই আমরা শক্তি খুঁজে পাব মানুষের নিজের আয়োজিত নির্যাতনগুলি প্রতিহত করার স্বপক্ষে। যে-নির্যাতন আজও সংঘটিত হচ্ছে আপন প্রজাতির বিরুদ্ধে, জীবজগতের বিরুদ্ধে, সমগ্র প্রকৃতিরই বিরুদ্ধে। আজকের বলদর্পী বিশ্বব্যবস্থা দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষের তৈরি সেই অমানুষী নির্যাতনযন্ত্রের ওপর। সেই নির্যাতনযন্ত্রকে ভাঙতে পারলে, তবেই প্রজাতি হিসাবেও মানুষের মুক্তি। হয়তো মানুষের জন্ম এইসব নানাবিধ নির্যাতনকে চূর্ণ করার জন্যই। এই পথেই হয়তো একদিন মিলে যাবে তার আত্মিক মুক্তি আর প্রজাতির মুক্তির যুগল স্রোতধারা। সমস্ত নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিরন্তর নিজেকে অতিক্রম করে যেতে যেতে, এক অনন্তের অস্পষ্ট আভায় নিজের যাবতীয় তুচ্ছতাগুলিকে অনুভব ক'রে বেদনার্ত হয়ে উঠতে উঠতে, এক রণভূমিহীন অন্নপূর্ণা পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের কুটুম্বিতার স্বপ্নসমুজ্জ্বলতায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে উঠতে, মানুষজনম যেন সার্থক হয়ে উঠবে তার, কোনও এক দিন!

আশ্বিন ১৪১৫

ভাষা লইয়া ভাসা ভাসা

উৎসর্গ : জয়দেব বসু, যাহার উস্কানিতে লিখা হইয়া উঠিয়াছিল এই গদ্যটি

'ভাষা বিষয়টিকে আমি নিজেই বহুদিন যাবৎ আপন সমঝে লইবার কোশেশ করিতেছি মাত্র। সহি কথা হইল, সে-বুঝদারি আজও কব্জা করিতে পারি নাই যাহাতে কোনও চূড়ান্ত হেস্তনেস্তে পৌঁছাইতে পারি। এহেন বেহাল দশায় আর কাহাকেও কিছু জানাইতে যাওয়া কেলেঙ্কারির একশেষ তো বটেই, যত বিশদে যাইব ততই উপরচালাকির এন্তেজারি করিতে হইবে বলিয়া শর্মিন্দা হইয়া আছি।'

এখন এই যে-কথাগুলি সদ্য পেশ করিলাম, এই তরিকায় তো আমার বাপ-চৌদ্দপুরুষ কেহই কখনও ভাবপ্রকাশ করেন নাই। পুরুলিয়া হইতে চট্টগ্রাম ইস্তক ভূখণ্ডে ইতস্তত ছড়াইয়া ছিটাইয়া বসবাসরত আমার কোনও ইয়ার-দোস্তও করেন বলিয়া শুনি নাই। তাহা হইলে অমন একটি বানোয়াট গড়ন ব্যবহার করিলাম কেন? উত্তর, আমার খুশি হইল, তাই। আমি যেমন খুশি তরিকায় লিখিব, তাহার উপর খবরদারি করিবেন কে? বিশেষত মুরুব্বিদিগের সাক্ষ্য মোতাবেক যখন দেখা গিয়াছে, ভাষা লইয়া একধরনের বেপরোয়াপনাই তাঁহাদের কুললক্ষণ। এই স্বাধিকারপ্রমত্ততাকেই অনেকে কহেন, লেখকের স্বাধীনতা।

লেখকের স্বাধীনতা আদতে অবশ্য একপ্রকার অশ্বডিম্ব। যদি প্রস্ফুটিত হইল তো একেবারে পক্ষীরাজ ঘোড়া, ডানা মেলিয়া কত না অজানা দিগন্তে উড়িয়া যাইবে পাঠিকাপাঠককে সওয়ার করিয়া। আর আণ্ডা যদি না ফুটে? তাহা হইলে আর কী, তোমার বাওয়া ডিম আগলাইয়া বসিয়া থাক, নহিলে নর্দমায় ফেলিয়া দাও। কাহারও কিছু আসে যায় না তাহাতে। হাজার হউক ভাষা একটি সামাজিক বিষয়।

বুঝিতে পারিতেছি, ইতোমধ্যেই বয়ান পরস্পবিরোধী হইয়া উঠিবার উপক্রম। তাহা হইলে পহেলা, বিষয়টিকে নিজের কাছে কিছুদূর স্পষ্ট করিবার প্রয়াস লওয়া যাক।

ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর ভাববিনিময়ের মাধ্যম। সেই ভাববিনিময়ের বুনিয়াদি অবলম্বন হইল মৌখিক বুলি বা জবান, যাহা বিলকুল অক্ষরনিরপেক্ষ। আপামর জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি ও তাহার মানসলোকের আর্তি-আকাঙ্ক্ষা, সকলকিছুর সহিতই সেই মৌখিক ভাষা নিবিড়ভাবে জড়িত। তাহা একদিকে এক যৌথস্মৃতির দ্বারা শাসিত, অথচ হরহামেশা যৌথতাতেই নিত্যজায়মান। তাই তাহা জীবন্ত ও অকৃত্রিম।

লিখিতভাষাও ভাববিনিময়ের মাধ্যম বটে, কিন্তু তাহা অক্ষরনিরপেক্ষ নহে। জনগোষ্ঠীর সাক্ষর অংশের ভিতরেই কেবল তাহার এখতিয়ারের এলাকা। লিখিতভাষার ভিত্তি যদিও মৌখিক বুলি, তথাপি তাহা ব্যাপক জনজীবনের দৈনন্দিনতায় সামিল নহে। যৌথস্মৃতির পরিবর্তে তাহা একপ্রকার যৌথ অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মৌখিক জবানের নিত্যজায়মানতার প্রভাবও তাহার উপর সরাসরি বর্তায় না। তাই প্রকৃতপ্রস্তাবে লিখিতভাষা একটি কৃত্রিম ভাষা, লেখকদের কলমে সৃষ্ট, ভাষার একটি বানোয়াট রূপ মাত্র।

নির্মিত ভাষা বলিয়াই লিখিতভাষার উপর লেখকের ব্যক্তিগত স্পর্শের এক বিরাট ভূমিকা থাকে। অনুকৃত ভাষা হইয়াও, ইহাকে যে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা লেখকের শৈলীর কারণে। কাজেই লিখিতভাষার রূপটি সামাজিক, কিন্তু শৈলী যদি কিছু থাকে, তবে তাহা ব্যক্তিক। একজন শক্তিমান লেখক সমসাময়িক বা তৎপরবর্তী লিখিতভাষার রূপের ভিতর অত্যন্ত নিঃশব্দে তাঁহার শৈলী চালান করিয়া দেন। এবং একমাত্র এইভাবেই লিখিতভাষার রূপে সময় হইতে সময়ান্তরে পরিবর্তনের লহর আসিয়া লাগে। সময়সাপেক্ষে, মৌখিক ভাষার জায়মানতাও যুগন্ধর লেখকের হাত ঘুরিয়া লিখিত ভাষার ভিতর কথঞ্চিৎ সঞ্চারিত হয়।

কাজেই সাহিত্যের আওতার ভিতর, লিখিতভাষাকে যেমন খুশি তেমন রূপ দিবার স্বাধীনতা যেমন যেকোনও লেখকের নিরঙ্কুশ, তেমনই জবরদস্ত এলেমদারি বিনা, তাহার প্রচলিত রূপকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করিবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য।

এখানে সওয়াল উঠিতে পারে, নিছক সাহিত্যের আওতার ভিতরেই তো লেখ্য ভাষার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নহে। লেখক এবং তাঁহাদের অনুগত পাঠকশ্রেণির বাহিরেও এই ভাষা তাহার কর্তৃত্ব ফলায়। সাহিত্য-পড়ুয়ারা সাক্ষরসমাজের বড়জোর ৫% হইলেও, তাঁহাদের তুলনায় সংখ্যায় অন্তত ১৯ গুণ বেশি মানুষ এই কর্তৃত্বের বলয়ের আওতায় পড়িয়া যান। এই সাহিত্য-বহির্ভূত সাক্ষর মানুষেরা যদি কোনও ভাষার লিখিতরূপের ব্যবহারে স্বস্তি বোধ না করেন, তবে কি তাঁহারা সাহিত্যিকদের তথাকথিত সম্ভাব্য/অসম্ভাব্য ক্ষমতার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিবেন, কবে কোন্ প্রতিভা ভাষার বদল ঘটাইবেন? যাঁহারা সাহিত্যের অংশীদারই নন, তাঁহারা কেন সাহিত্যের মুখাপেক্ষী রহিবেন! ইহার বাহিরেও কথা আছে। সাক্ষরের স্মৃতিবাহিত হইয়া লিখিত ভাষা নিরক্ষরের এলাকাতেও প্রবেশ করে। বোঝার উপর শাকের আঁটির ন্যায়, লিখিবার ভাষা তখন নিরক্ষরের উপর ক্ষমতাতন্ত্রের বাড়তি ভয়-মুখোশ হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ভয়টা, দেখা যায়, নিরক্ষরদের হইয়া সাক্ষররাই বেশি বেশি পাইতে থাকেন, এই ভাবিয়া যে, পাছে নিরক্ষররা ভয় পান! কারণ ইহাই ক্ষমতাতন্ত্রের তরিকা, ভয় দেখানোর এবং ভয় পাইবার সম্ভাবনাগুলি সকলই তাহার সৃষ্ট।

এখন দেখা যাউক, সাহিত্যের বাহিরে লেখ্য ভাষার শুঁড়গুলি আর কোন কোন দিকে বিস্তৃত। এই বিস্তার মোটের উপর ত্রিমুখী - অনুশাসন, বিনোদন ও জ্ঞানচর্চা। অনুশাসন দুই প্রকার - ধর্মানুশাসন ও রাজানুশাসন। বিনোদনও দুই প্রকার - খবর (পত্রিকা-বেতার-দূরদর্শন-আন্তর্জালাদি) ও জবর (রেডিও-টিভি-যাত্রা-সিনেমা-নাট্যাদি)। জ্ঞানচর্চার অধীনে রহিয়াছে, অধ্যাপন (প্রাক্‌প্রাথমিক হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া) ও অধ্যয়ন (বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা-সমালোচনা)। এইসব শুঁড়ের বিস্তারেই লিখিতভাষা সাহিত্যের বাহিরেও তাহার রাজ্যপাট চালায়। এইগুলি হইতেছে ভাষার সামাজিক অনুষঙ্গ। এইসব এলাকায় ভাষার প্রয়োগ লইয়া আদৌ কোনও সংশয় দেখা দিলে, তাহা সাহিত্যের আওতার ভিতর পড়ে না। সামাজিকভাবেই তাহার নিষ্পত্তি হওয়া বিধেয়।

২.

অতঃপর আমরা বাংলাভাষার বিচিত্র ক্ষেত্রটিতে আসিতে পারি। একটি বিষয় আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল যে, বাংলা বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান একটি ভাষা। তাহা শুধুমাত্র সাহিত্যিক ঐতিহ্যের গৌরবে মাত্র নহে, নিছক সংখ্যাতত্ত্বের বিচারেও দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের ফর্দের উপরের দিকেই তাহার স্থান। হালফিল একাধিক রাষ্ট্রের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নানাবিধ ভূখণ্ডে বাংলাভাষা প্রচলিত। মানুষের মুখে মুখে কত না বিভিন্ন তাহার রূপ! লেখকদিগের কলমে কলমে কত না বিচিত্র তাহার বিস্তার। তথাপি দুনিয়ার যেকোনও প্রান্তে বসবাসরত একজন বাঙালি, যেকোনও বাংলা কিতাব পড়িলেই, বহিটির অবলম্বন যে বাংলাভাষা, তাহা অদ্যাবধি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তের যেকোনও বাঙালি লেখক, মৌখিক বাংলার যে কোনও একটি রূপ-কে আশ্রয় করিয়া, বা তাহার ১০রকম রূপ-কে মিশ্রিত করিয়া, তাঁহার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাইতে পারেন। তাঁহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। কোনও দেশের কোনও আইন তাঁহাকে ঠেকাইতে পারিবে না। তাঁহার একমাত্র শাস্তা হইতেছেন পাঠিকা-পাঠক বর্গ। যাঁহারা সামান্য নাসিকাকুঞ্চনে, ভাষা লইয়া সেই লেখকের যাবতীয় কেরদানিকে নাকচ করিয়া দিতে পারেন, অথবা বাহবা দিয়া মাথায় তুলিয়া নাচিতে পারেন। সেই বহুমূল্য পাঠক-প্রতিক্রিয়াকেও অবশ্য লেখক শেষতক উপেক্ষা করিতে পারেন, এমন কি জিন্দেগি-বরাবর অপঠিত থাকিবার ঝুঁকি লইয়াও, এমনই লেখকের স্বাধীনতার সীমানা! কাজেই তাঁহার ডানা ছাঁটিবে কে? লেখকের ভাষার উপর খবরদারি করিবার যেকোনও সরকারি-বেসরকারি প্রয়াস তাই নিন্দার যোগ্যও নহে, তাহা নিতান্ত হাস্যকর ও উপেক্ষণীয়।

ইহার পর পড়িয়া থাকে ভাষাব্যবহারের সাহিত্য-বহির্ভূত এলাকাগুলি, যাহাদের ত্রিস্তর বিন্যাসটি কিছু পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। সেই অনুশাসন,

বিনোদন ও জ্ঞানচর্চার বন্দোবস্তগুলি বাংলাভাষার বর্তমান পর্যায়ে কীরূপ তাহা বিবেচনা করা যাউক।

প্রথমত ধর্মানুশাসন। এক্ষেত্রে বাঙালির কোনওপ্রকার ল্যাঠা নাই, কারণ ধর্মগ্রন্থগুলি আরবি-সংস্কৃত-হিব্রু-পালি-ইংরেজি ইত্যাকার অবাংলা ভাষায় রচিত। বাঙালিদের ভিতর সেরূপ ধর্মোন্মাদ ব্যক্তির অভাব কোনওযুগেই ঘটে নাই, যাঁহারা পুণ্যার্থে এমনকি মাতৃভাষার ছায়া না মাড়াইতেও তৈয়ার। সম্ভবত ইঁহাদেরই একপ্রকার আধুনিক সংস্করণ দেখা গিয়াছিল বিগত শতকের ৬০-৭০ দশকের পশ্চিমবঙ্গে, যাঁহারা নাকি আওয়াজ উঠাইয়াছিলেন - ভুলতে পারি বাপের নাম/ভুলব নাকো ভিয়েতনাম কিংবা চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান ইত্যাদি! ধর্মানুগত বাঙালিদিগের কোনও তীর্থস্থান আপন ভূখণ্ডে নাই। পরকালের ব্যবস্থা পাকা করিতে তাহাকে মক্কা-গয়া-কাশী-আজমীর দৌড়াইতে হয়। কাজেই বাংলা লেখ্যভাষার রূপ লইয়া কোনও স্বদেশীয় ধর্মব্যবসায়ীকে বড় একটা ভাবিতে দেখা যায় নাই (রামমোহনকে নিছক ধর্মপ্রচারক বলা যায় না)। বরং বিদেশী দুইজনের কথা এইসূত্রে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণে আসে - পোর্তুগিস পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্পসাওঁ এবং শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরী, ভুলভ্রান্তিসহ ভাবিলেও লেখ্য বাংলার রূপ লইয়া তাঁহারা কিছু ভাবিয়াছিলেন।

ইহার পর আসিতেছে রাজানুশাসন। ইহার নিয়ামক হইতেছে রাষ্ট্র। এখন রাষ্ট্র, সে রাজতন্ত্রই হউক বা গণপ্রজাতন্ত্র, তাহা একটি ক্ষমতা প্রয়োগের যন্ত্র। সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ভাষার বিষয়েও রাষ্ট্র একটি নীতি প্রণয়ন করে এবং তাহা তাহার নাগরিকদের উপর চাপাইয়া দেয়। সেই নীতিটি মোটের উপর এইরূপ যে, প্রতি ৫কি.মি. অন্তর তোমাদের মুখের বুলি পাল্টাইয়া যায়, যাউক, ইহা লইয়া আমার বলিবার কিছু নাই। কিন্তু আমার পক্ষে তো তোমাদের সহিত শতমুখে আলাপ করা সম্ভব নহে। তাই আমি ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য (আমার বিচারে) একটি রূপ স্থির করিয়া দিতেছি, ইহাতেই আমার তরফে তোমাদের সহিত যাবতীয় যোগাযোগ চালু রহিবে। অনুরূপভাবে, আমার নজর কাড়িতে হইলে তোমাদেরও ভাষার ওই সুনির্দিষ্ট রূপটিকেই ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাই হইল ভাষার প্রমিত রূপ। ইহাকে কোনও জুলুমবাজি ভাবিও না। আমি তো কোনও ফরমান জারি করিয়া এই প্রমিত রূপ প্রণয়ন করি নাই। তোমাদেরই গণমাধ্যম, তোমাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি তোমাদের বহুবিক্রিত লেখকেরা পর্যন্ত ভাষার যে-লিখিত রূপটি ব্যবহার করিয়া বাণিজ্যসাফল্য পাইয়াছেন, আমি তাহাই আমল করিয়াছি মাত্র।

নিজমুখে জুলুমবাজি বলিয়া কবুল না করিলেও, সংবেদনশীল মানুষ এই ব্যবস্থাপনাকে রাষ্ট্রের জুলুমই কহিবে। কিন্তু ভাষা লইয়া রাষ্ট্রের এই জুলুম তো তাহার অন্যান্য জুলুম হইতে বিচ্ছিন্ন কিছু নহে। বস্তুত রাষ্ট্র-নামক ধারণাটির

বিরোধিতা না করিয়া, রাষ্ট্রভাষার ধারণারও বিরোধিতা করা যায় না। যাঁহারা রাষ্ট্রীয় প্রমিত ভাষার কোনওরূপ সংস্কার চাহেন, তাঁহারা বস্তুত প্রচলিত জুলুমের বদলে নূতন আর এক কিসিম জুলুমের প্রচলন চাহেন মাত্র। যতদিন না, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের ধারণা ভাঙিয়া অগণিত নগররাষ্ট্র বা গ্রামরাষ্ট্রের পত্তন হইতেছে, ততদিন ওই ৫কি.মি.-ঈয় ভাষাগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনও সুযোগ নাই। রাষ্ট্রের আরও এক সুবিধা এই যে, যাঁহারা তাহার বিরোধিতায় লিপ্ত হন, সচরাচর তাঁহারাও তাঁহাদের সংগ্রামী তহবিল গঠন করেন রাষ্ট্রীয় মুদ্রায়, বিদ্রোহী ইস্তাহারগুলিও রচিত হয় রাষ্ট্রীয় ভাষায়।

এখন বাংলাভাষায় প্রবেশ করিলে দেখি, আজ ৬৩ বৎসর হইয়া গেল বাংলাভাষা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত। রাজানুশাসনের ভাষা কোথায় কী রূপ পরিগ্রহ করিবে, সত্য কথা বলিতে গেলে, তাহা নিছক সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন রাষ্ট্রনীতির বিষয়। এই যে বাংলাদেশের কাগজি মুদ্রার উপর লিখা থাকে, 'বাংলাদেশ ব্যাংক চাহিবামাত্র ইহার বাহককে ***টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে', এই বাক্যটি বুঝিতে যদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অসুবিধা বোধ করেন, তাহা হইলে বাক্যটি তাঁহারা বদলাইবেন। বদলাইয়া তাঁহারা কী লিখিবেন, তাহাও সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই স্থির করিবেন। ইহা একটি পুরাদস্তুর রাষ্ট্রনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ। আমরা যাহারা বাংলাদেশের নাগরিক নই, তাহাদের এবিষয় করণীয় কিছুই নাই, করিবার কোনও অধিকারই নাই। আমরা বড়জোর কিছু উড়ো মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি মাত্র। বলিতে পারি, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই ঘোষণাটিকে আমরা এখনও অবধি দিব্য বাংলা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি।

৩.

সওয়াল উঠিতে পারে, বাংলাদেশে কী হইলে কী হইতে পারে সেই ধানাইপানাই না গাহিয়া, পশ্চিমবঙ্গের কথা কিছু বলা হইতেছে না কেন? ইহা কি শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার কোনও প্রয়াস? কারণ ইহা তো লুকাইবার মতো কোনও তথ্য নহে যে, বিভাগপূর্ব বঙ্গদেশের কলিকাতা নগরীতে একদা ভাষার যে-শিষ্টরূপটি নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাই অদ্যাবধি আগরতলা, শিলচর, কলিকাতা এবং ঢাকার উপর সমভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। অতএব, পশ্চিমবঙ্গে শিষ্ট বাংলা বলিয়া যাহা চালু আছে, পহেলা তাহার স্বভাব-চরিত্র লইয়া কিছু কবুল করা উচিত হয় না কি?

মানিতেই হয়, এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া, বাংলাভাষার লিখিত রূপ লইয়া যেকোনও আলোচনা এক কদমও আগে বাড়িতে পারে না। কিন্তু কলিকাতা-নিষ্কাশিত ভাষার সেই রূপ শেষ বিচারে সাহিত্যনিরপেক্ষ একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থান প্রসূত হইলেও, তাহার সহিত নানাবিধ সাহিত্যিক তৎপরতাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাই সেই পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিবার জন্য কিছু স্বতন্ত্র

অভিনিবেশ প্রয়োজন। তাহা বারান্তরের কোনও প্রয়াসের জন্য আরব্ধ রাখিয়া, আপাতত আমরা সাহিত্যের আওতার বাহিরে অন্য আর যে-ক্ষেত্রগুলিতে লেখ্যভাষা তাহার প্রতিপত্তি জারি রাখে, সেগুলির দিকে একবার চোখ ফিরাই।

আমাদের পুর্ব উল্লেখ অনুযায়ী, অনুশাসন ছাড়াও বিনোদন এবং জ্ঞানচর্চার এলাকাগুলিও কমবেশি ভাষার লিখিত রূপের মাস্তানির মানচিত্রে পড়িয়া যায়। ইহার ভিতর জ্ঞানচর্চা পুরাদস্তুর ও বিনোদনের 'খবর' অংশের মুদ্রণমাধ্যমটি, রাজানুশাসনে ব্যবহৃত ভাষার হাত ধরাধরি করিয়া চলে। বরং দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়, আকাদমি বা সংবাদপত্রের পরোক্ষ অনুমোদন লইয়াই সরকারি ভাষা কাজ করে। দেখিয়া লইতে পারি, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত আজিকার (১১ অগস্ট ২০১০) তারিখের খবরকাগজে মুদ্রিত দুইটি সরকারি বিজ্ঞাপনের কিয়দংশ–

> ১. পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বস্ত্র অধিকার, দেবীপুর (বর্ধমান) হস্ততাঁত মহল্লা প্রকল্পের সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্রের শুভ শিলান্যাস অনুষ্ঠান ... সবারে করি আহ্বান।
>
> ২. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে পূর্ব রেলওয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'সংস্কৃতি এক্সপ্রেস' – সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ৫-কামরার একটি প্রদর্শনী ট্রেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও বহুমুখী সৃষ্টিকর্ম মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য এক বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি দেবে। ... প্রবেশ অবাধ, সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

বর্ধমানের তাঁতিদের জন্য রচিত বলিয়া, প.ব. রাজ্য সরকারি আহ্বান 'সবারে' – প্রাচীনতর ও পূর্ববঙ্গীয় '-রে' প্রত্যয় বুঝি বেশি লোকায়ত, সম্ভবত এই বিবেচনায়। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের হয়তো বা অপেক্ষাকৃত নাগরিক গন্তব্য, আমন্ত্রণ 'সকলকে'। এইসব স্ববিরোধিতা লইয়াই গণমাধ্যমের বিবেচনাহীন লেখ্য ভাষা!

বিনোদনের 'জবর' অংশটি, যাহার ভিতর রেডিও-টিভি-যাত্রা-সিনেমা-নাট্যাদি পড়ে, ভাষার বিষয়ে বরং অধিকতর স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে। বাংলা নাট্যচর্চার শুরুয়াত হইতেই নাট্যকারগণ পাত্রপাত্রীর মুখে তাহাদের স্থানীয় জবান জোগান দিয়াছেন। সিনেমা ও সাবাননাট্যেও সেই ট্রাডিশন জারি আছে। তবে এইসব ক্ষেত্রেও, নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য প্রধান চরিত্রদের উপর আবার রহিয়াছে, উচ্চারণের শুদ্ধতার খড়্গ। সেইসব উচ্চবর্গীয়রা হারগিজ নাগরিক, ফলত তথাকথিত 'শুদ্ধতা'র তোতাপাখি। সংবাদপাঠকদেরও অনুরূপ শুদ্ধতা বহাল রাখিতে হয়। এমন কি, ইহাও বলা হয় যে বেতার-টিভি'র বাংলা উচ্চারণই আদর্শ বাংলা উচ্চারণের নমুনা, যেমন কিনা বিবিসি ইংলিশ!

মুখের কথা 'শুদ্ধ' বলিবার মাপকাঠি লইয়া খুব একটা মাথা না ঘামাইয়া গ্রাম-মফস্বলের বাঙালিরা কিন্তু রাষ্ট্রনির্বিশেষেই নিজের মতো করিয়া কথা বলিয়া যান। প.বাংলার অভিবাসিত পূর্ববঙ্গীয়রা তো বটেই (তাঁহাদের সংখ্যা কোটির

অধিক), তাঁহারা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ-মালদহ-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুরের মানুষ, শুধু আপন আঙিনার চৌহদ্দিতেই নহে, এমনকি নিজেদের জেলাসদরের কাছারিতেও আপন আপন মুখের বুলিতে অবলীলায় কথা কহিয়া যান। তবে তাঁহাদের নিজস্ব রেডিও-টিভি না থাকায়, এই প্রশ্নটি উঠে না যে, তাঁহারা কেন আয়াস করিয়া কলিকাতার বুলি আওড়াইবেন। ইহার স্বপক্ষে তরুণ রবীন্দ্রনাথ (২৪) একপ্রকার ক্ষমতাতান্ত্রিক যুক্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন - 'বাংলাদেশের নানা স্থানে নানা প্রকার উচ্চারণের ভঙ্গী আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার' (আশ্বিন ১২৯২)। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে যখন তিনি শান্তিনেকতনে বাংলা শব্দতত্ত্ব লইয়া চর্চা করিতেছেন, তখন বাংলার সকল অঞ্চলের উচ্চারণের তুলনামূলক পর্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ কাজটির সূত্রপাত আবার তিনিই ঘটাইয়াছিলেন। সমসাময়িক একটি নিবন্ধে তিনি লেখেন - 'বাংলা শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উচ্চারণগুলির তুলনা আবশ্যক। ...বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলা হইতেই আমাদের আশ্রমে ছাত্রসমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের সাহায্যে বাংলা ধাতুরূপ ও শব্দরূপের তুলনা-তালিকা আমরা বাহির করিতে চাই। নীচে আমরা যে তালিকা দিতেছি তাহার অবলম্বন কলিকাতা বিভাগের বাংলা। পাঠকগণ ইহা অনুসরণে নিজ নিজ প্রদেশের উচ্চারণ-অনুযায়ী শব্দতালিকা পাঠাইলে আমাদের উপকার হইবে' (আশ্বিন ১৩২৬)। কলিকাতা বিভাগের বাহিরে বাংলার প্রতিটি প্রদেশের মানুষ যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদর নিজ নিজ বুলিতে কথা বলেন এবং বলিয়া চলিবেন, এই সহজ সত্যটি এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। এবং ঠাকুর ইহাও রটাইলেন যে, বাংলাভাষার সামগ্রিক গড়নটি অনুধাবন করিতে হইলে, ওই প্রতিটি প্রাদেশিক উচ্চারণকেই সমঝদারিতে আনিতে হইবে। উচ্চারণের আদর্শ লইয়া বাংলার বিশিষ্ট আভিধানিক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধার করিয়া আজিকার মতো ক্ষান্ত হই - 'ঢাকাও বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, এবং এখনও পূর্ববঙ্গের প্রধান ও বঙ্গের দ্বিতীয় রাজনগরী। অতএব ঢাকার উচ্চারণ আদর্শ কেন না হইতে পারিবে? (কলিকাতা, ৩১শে চৈত্র ১৩২৩)'। প্রিয় পাঠিকা ও পাঠকদের ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাতুলতা যে, বর্তমানে ঢাকা বিগত ৪দশক ধরিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী।

আমাদের এই সামান্য বয়ান আপাতত এই পর্যন্তই।

আগস্ট ২০১০

নৈরাজ্যবাদ শেষ পর্যন্ত নিজেকেই আঘাত করে। এই প্রবচনটি যাচাই করার জন্যই যেন গৌতম চৌধুরী এক আত্মপরিহাসে লিপ্ত এই গদ্যগুলির নির্মম বয়ানে। যা, তাঁর কবিতা-প্রয়াস থেকে আপাতদৃষ্টে যোজনদূরত্বে থেকেও যেন, কোনওভাবে গত তিন দশক ধরে সেই নিঃসঙ্গ আর্তিকেই শুশ্রূষা দিয়ে গেছে অকাতরে। তবু, এদের কবিতানিরপেক্ষ পাঠেরও যে এক স্বতন্ত্র অভিমুখ রয়ে গেছে, তা ধরা পড়ল এই সংকলনে এসে। যা রাষ্ট্র, ভাষা ও কাব্যরাজনীতির প্যাঁচ ও পয়জারগুলি অতঃপর অপ্রস্তুত পাঠকের সামনে উন্মোচন করে এক দ্বিধাহীন সারল্যের আঁচে। *গরুর রচনা*, বস্তুত, আমাদের রোমন্থনমত্ত, গৃহপালিত ও তৃণভোজী সত্তার এক পাথুরে শোকলিপি মাত্র।